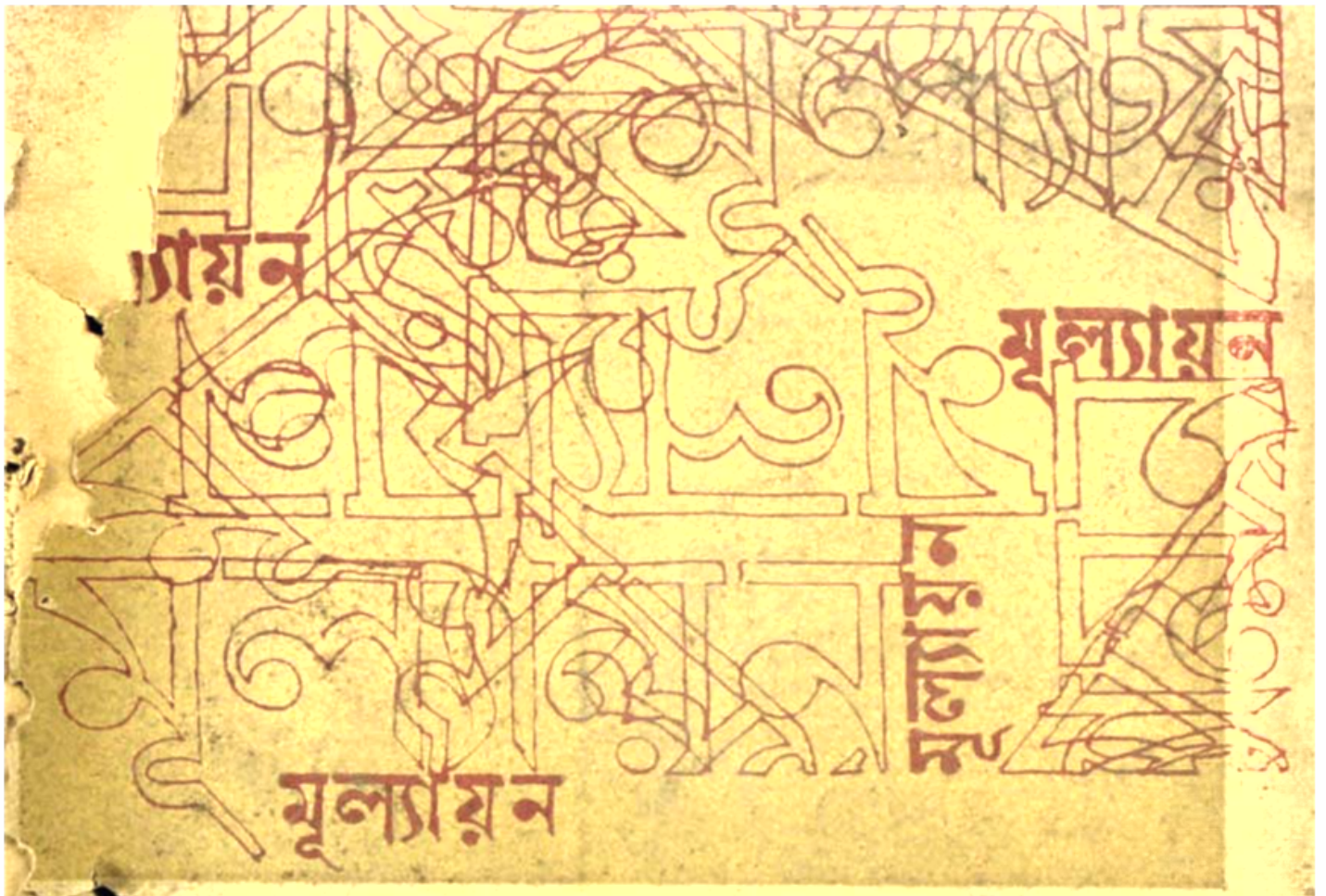

- স্তালিনের ভূমিকার মূল্যায়ন
- স্তালিন ও ভারতবর্ষ
- লেনিন—ম্যাকসিম গোর্কি
- কিউবা বিপ্লব
- ধর্মঠাকুর, ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল
- কোংকনী লোকগীতির রূপরেখা

১৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

দাম ঃ দেড় টাকা

মূল্যায়ন

১৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা
১৩৮৬

সূচী পৃষ্ঠা

ধর্মঠাকুর, ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল / সুকুমার মিত্র ১
কিউবা বিপ্লব : সংগ্রামী অতীত / ভানুদেব দত্ত ১২
ক্যোংকনী লোকগীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / শম্ভু মিত্র ২২
লেনিন / ম্যাক্সিম গোর্কি ৩২
কমরেড স্তালিনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে / সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ৩৮
স্তালিন ও ভারতবর্ষ / নরহরি কবিরাজ ৫৪
স্মৃতিচিত্র / সরোজ দত্ত ৬১
সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য / রণধীর দাশগুপ্ত ৬৭
পুস্তক পরিচয় ৭৬
বিয়োগপঞ্জী ৮২

সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ

উপদেষ্টামণ্ডলী :

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পরিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল জানা,

নির্মাল্য বাগচী, রণধীর দাশগুপ্ত।

রণধীর দাশগুপ্ত কর্তৃক কালাবর প্রেস, ৩০/৬ কাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭

থেকে মুদ্রিত ও ১০নং বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত।

গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়িদের কাছে আবেদন

'মূল্যায়ন'-এর প্রকাশক পবিত্র রায়ের মৃত্যুতে প্রকাশক পরিবর্তনের গুরু দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়ে। ফলে পত্রিকার ঘোষণাপত্রে পরিবর্তন সাধন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই পরিবর্তনের কাজ সমাধা করতে বিশেষ বিলম্ব হল।

অনিবার্য কারণবশতঃ পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমরা আমাদের গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়িদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এখন থেকে নিয়মিত প্রকাশের প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি।

পরবর্তী সংখ্যাটি শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এতে সমকালীন রাজনীতিগত ও মতাদর্শগত সংগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদক

মূল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৪নং ফরম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের সময়—ত্রৈমাসিক।

৩। মুদ্রক—রণধীর দাশগুপ্ত

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯

৪। প্রকাশক—রণধীর দাশগুপ্ত।

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯

৫। সম্পাদক—নরহরি কবিরাজ।

জাতীয়তা—ভারতীয়।

ঠিকানা—১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯।

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী।

ঠিকানা—১০, বঙেল রোড, কলিকাতা-১৯।

আমি, শ্রীরণধীর দাশগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং ১৫/৬/৮০

রণধীর দাশগুপ্ত

প্রকাশক

ধর্মঠাকুর, ধর্মপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল

সুকুমার মিত্র

(শেষার্ধ)

যাদু নাথের ধর্মপুরাণ : "শূন্যপুরাণ" নাম দিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি বিভিন্ন যুগে রচিত এবং প্রধানতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মপূজাপদ্ধতি ইত্যাদি সেগুলির বিষয়বস্তু। 'শূন্যপুরাণ', 'ধর্মপূজা পদ্ধতি' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইবে। "ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণ" জাল গ্রন্থ, কাজেই তাহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত "যাদু নাথের ধর্মপুরাণ" (সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী) ধর্মসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় "যাদুনাথের ধর্মপুরাণের" পুঁথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন। যাদু নাথ বা যাদব পণ্ডিতের বাড়ী ছিল হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডোমজুড় গ্রামে এবং জাতিতে সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন নাথ-যোগী এবং ধর্মে বৈষ্ণব। যাদু নাথের ধর্মপুরাণের রচনাকাল বাং ১১০৩ সাল অর্থাৎ ইং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। শোভা সিংহের বিদ্রোহকালে যাদু নাথ তাঁহার ধর্মপুরাণ রচনা করেন।

যাদু নাথের ধর্মপুরাণে ধর্মবন্দনা করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে। গণেশ বন্দনা করিয়া তিনি গ্রন্থারম্ভ করেন নাই। যাদু নাথ রামাই পণ্ডিতকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছেন এবং তাঁহার মতে রামাই পণ্ডিতই পৃথিবীতে ধর্ম-মঙ্গলের প্রকাশক। রামাই পণ্ডিত নিজেই কল্কি অবতার। বৈষ্ণব হইয়াও যাদু নাথ তাঁহার গ্রন্থকে 'আগম: প্রকাশ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মপুরাণে শক্তিপীঠের বন্দনা ও বর্ণনার বাহুল্যে মনে হয় যেন শক্তি-পূজার ভূমিকাতেই ধর্মপূজার প্রবর্তনা। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে যাদু নাথ মহানন্দ পীঠের সমর্থক ও প্রচারক। ময়ূর ভট্ট মহানন্দ পীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক ছিলেন।

যাদু নাথের ধর্মপুরাণে ধর্ম ঠাকুরকে লইয়া উচ্চ বর্ণ ও নিচু বর্ণের বিরোধ ও আপসের কাহিনী বেশ বিস্তারিতভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে ইঙ্গিত যাদু নাথের ধর্মপুরাণে পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়কর ও দুর্লভ। ধর্মসাহিত্যে দশ অবতারের বন্দনা যাদু নাথই প্রথম করিয়াছেন এবং মানিকরাম তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। মানিক রাম যাদু নাথকে অনুসরণ করিলেও ধর্মঠাকুরকে 'বুদ্ধ-কল্কি' অবতাররূপে বন্দনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যাদু নাথ ধর্মঠাকুরকে দিয়া দিল্লীতে বাদশাহী প্রভুত্বও করাইয়াছেন। আর পীর হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের তীর্থস্থানগুলির উপরেও তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নাই।

দশ অবতারের বন্দনায় যাদু নাথ লিখিয়াছেন :

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির
দুনিয়া আলমে বন্দো যত আছে পীর।
হজ মক্কা বন্দিলাম যবনে ভেস্তি
বাবুর মোকাম আদি বন্দিনু সমস্তি।

আর যাদু নাথের মতে কলিকালে যবন বাদশাহরূপেই ধর্মঠাকুরের আধিপত্য। তাই তিনি লিখিয়াছেন :

দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার
সত্য শূন নাম তার মেলচ্ছ আকার।
যবনরূপে দিল্লীতে কৈলে পাচ্চাই ঠাকুরালি
যবনরূপে একাকার সংহারিলে কলি।

(সাহিত্য প্রকাশিকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭)

ধর্মঠাকুরের ভক্ত যাদু নাথ হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দেবতা অনায়াসেই মুসলমান বাদশাহরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। পরম বৈষ্ণব, শক্তির পূজারী এবং ধর্মঠাকুরের ভক্ত যাদু নাথের রচনায় নানা ধর্মমতের বিচিত্র ধারাগুলি একটি খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার রচনায় বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবেরও আভাস পাওয়া যায়। ভূত প্রেত অপদেবতাদেরও তিনি বন্দনা করিয়াছেন এবং ডঃ মণ্ডলের মতে অপদেবতাদের মধ্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেব-দেবীর নাম প্রচ্ছন্ন থাকা আশ্চর্য নহে। একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, যাদু নাথের ধর্মপুরাণ বহন করিয়া আনিয়াছে সমন্বয় ও

মিলনের বাণী, বিরোধের সুর যদি কোথাও থাকিয়া থাকে তাহা নিতান্ত ক্ষীণ। মুঘল সম্রাটের অসীম ক্ষমতা, সামরিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই অভিভূত করিয়াছিল। তাই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"* যবন সম্রাট অনায়াসেই যাদু নাথের ধর্মপুরাণে ধর্ম-নিরঞ্জনের দশম অবতাররূপে দেখা দিয়াছেন। এ অবতারে আবার বুদ্ধ ও কল্কী একীভূত হইয়াছেন। ধর্মঠাকুর রাজা-দেবতা, কাজেই রাজা হইতে তাঁহার কোন বাধা নাই এবং গৌড়ের অধিপতিরূপে তাঁহাকে ধর্মসাহিত্যে একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। কিন্তু দিল্লীর "ম্লেচ্ছ" বাদশাহরূপে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে একমাত্র যাদু নাথের ধর্মপুরাণে।

'অনিলপুরাণ', 'শূন্যপুরাণ', 'ধর্ম পূজাবিধান'

ধর্মপুরাণের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞানুসারে 'যাদু নাথের ধর্মপুরাণ'কে ঠিক ধর্মপুরাণ বলা চলে না। ইহাতে ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ উভয় শ্রেণীর ধর্মসাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ ধর্মপুরাণ মাত্র দুইখানি পাওয়া গিয়াছে, সহদেব চক্রবর্তীর এবং "কবি" লক্ষণ—"রামাই পণ্ডিতের"। সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিল পুরাণে'র রচনাকাল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়।

---

* সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মহেশ ঠাকুর নামক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃতী শিষ্য পণ্ডিত রঘুনন্দন মিশ্র পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের জন্য বহু ধনীর দ্বারে দ্বারে বৃথাই ঘুরিয়া অবশেষে ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের নিকট উপস্থিত হন। সম্রাটের সভাপণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পান। তখন আকবর তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনন্দন উত্তরে বলেন :

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
মনোরথান পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যেন কিঞ্চিৎ ধনিকেন দত্তম
শাকায় বা স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ।

গুণগ্রাহী আকবর রঘুনন্দনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিহুত জেলার হাটি পরগণার অন্তর্গত যে সম্পত্তি রঘুনন্দনকে দান করেন তাহা এখনও মহেশ ঠাকুরের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন (প্রবাসী, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩১)

সহদেব চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিগড় পরগণায় রাধানগর (নামান্তর নন্দনবাটী) গ্রামে। সহদেব চক্রবর্তী কানু রায়ের ভক্ত।

দ্বিজ সহদেব গায় দয়া কৈলে কানু রায়
স্বপনে শিখালে যারে গীত!
শ্রীধর্ম-মঙ্গল দ্বিজ সহদেব ভণে
কালাচাঁদ যারে কৃপা করিল স্বপনে।

অথবা,

সোনার নূপুর পায় উর বাপা কানু রায়
যারে কৃপা করিলা স্বপনে!

সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ বা বাসু পুরাণে জাজপুর কাহিনী আছে। নানা দিক হইতেই এই কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি অষ্টাদশ শতকের "কবি" লক্ষ্মণ-রামাই পণ্ডিত এবং দ্বিজ শ্রীরাম পণ্ডিত বা রাম দাসের 'শ্রীধর্ম-পুরাণ' পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। বর্ধমান হইতে হরিদাস পালিত কর্তৃক সংগৃহীত "ধর্মপূজাপদ্ধতি" এবং নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "শূন্যপুরাণ" ও ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ধর্মপূজাবিধান" গ্রন্থে জাজপুর কাহিনীর কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত আছে জাজপুরের কাহিনীর মূল নিহিত আছে বাংলা দেশে পাঠান আমলের ইতিহাসের মধ্যে। বাংলার স্বাধীন সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলক দুইবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। দুই বারই তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনার পর ব্যর্থকাম ফিরুজ মন্দিরাদি ধ্বংস করেন, পুরীর মন্দির কলুষিত করেন এবং ব্রাহ্মণদের উপর নির্মম অত্যাচার করেন। মুসলমান শাসকদিগের মধ্যে ফিরুজ তুঘলকই প্রথম ব্রাহ্মণদের উপর 'জিজিয়া' কর স্থাপন করিয়াছিলেন।

জাজনগরে ফিরুজ শাহ তুঘলকের মন্দির ধ্বংস ও ব্রাহ্মণ নির্যাতনের কাহিনীই ধর্মপুরাণ ও ধর্মপূজা বিধানে এক বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। কাব্যমূল্য কিছু না থাকিলেও ধর্মীয় বিরোধ ও মিলনের যে চিত্রটি জাজনগর সংক্রান্ত ছড়াগুলিতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা বিশেষ মূল্যবান।

কাহিনীর বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

"জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্মদ্বেষ, তৎপ্রতিকারার্থে তাঁহাদিগের গৃহে ধর্মের জন্মগ্রহণ ও ম্লেচ্ছত্ব অবলম্বনে সকলের জাতিনাশ, তৎপ্রযুক্ত সকলের ধর্মভীতি ও পরিত্রাণ লাভ।" (সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল—অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ব: সা: প: পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা)।

সহদেব চক্রবর্তীর অনিল পুরাণের জাজনগর সংক্রান্ত ছড়া "শূন্যপুরাণে"র "শ্রীশ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা" (উষ্মা) এবং "ধর্মপূজা বিধানের" "কল্মিমাজালান" বা জালালী কলিমার অনুরূপ, পাঠান্তর বলিলেই চলে। লিপিকারদের অজ্ঞতা-বশতঃ বর্ণাশুদ্ধির ফলে অনেক স্থানে পাঠ বা অর্থ উদ্ধার করা কঠিন।

"শ্রীশ্রী নিরঞ্জনের রুষ্মা (উষ্মা) এবং "কল্মিমা জালানের" পাঠ মিলাইয়া মোটের উপর ছড়াটি নিম্নরূপ :

জাজপুর পুরবাসি সোলসএ ঘর বেসি
বেদি লয় কেবল দুর্জন
দক্ষিণা মাগিতে জাএ জার ঘর নাহি পাএ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন।

* * *

মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিস পাস।
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ বেব্যাএ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥

কবিতাটির ভাবার্থ মোটামুটি এইরূপ :

জাজপুরে ষোল শত ঘর বেদব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ থাকে। তাহারা দক্ষিণার জন্য জুলুম করে, যাহার ঘরে দক্ষিণা না পায় সাপ তাহার ঘর-বাড়ী পুড়াইয়া দেয়। এই ব্রাহ্মণেরা অনেক ভোজবাজী জানে, মুখ দিয়া আগুন বাহির

করে। তাদের ভয়ে লোকে কাঁপে। দল বাঁধিয়া তাহারা সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করে। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সকলেই ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানায়।

কবিতার এই অংশে ধর্মভক্তদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাই ধর্মপূজা করিত এবং পাঠান আমলের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধর্ম, মনসা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের অর্থাৎ লৌকিক দেবতাদের অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন। সম্ভবতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইত। ধর্মভক্ত সাধারণ মানুষের উপর বেদব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কোন ঘটনা উল্লিখিত ছড়ায় চিত্রিত হইয়াছে।

কবিতাটির পরবর্তী অংশে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার হইতে সাধারণ মানুষের পরিত্রাণ লাভের কাহিনীর মধ্যে আজমপুরে ফিরুজ শাহের তুঘলকের আক্রমণ ও ব্রাহ্মণ নির্যাতনের ঐতিহাসিক তথ্য স্থান পাইয়াছে। মুসলমানদের হাতে ব্রাহ্মণগণ জব্দ হওয়ার একটা চাপা উল্লাসের ভাবও এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধর্ম্ম মনেত পাইয়া মর্ম্ম*
মায়াতে হোইল অন্ধকার।*
ধর্ম্ম হইল জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার**
মুখেত বলেন দমদার***

---

* পাঠান্তর—অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মায়ারূপী হৈল খোন্দকার (যে মুসলমান সুন্নৎ করান অর্থাৎ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন)

** ভেস্ত—বেহেস্ত, ভেস্ত অবতার অর্থাৎ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইল।

*** মদারি মতের মুসলমান ফকীরেরা "দম মাদার" এই ডাক ছাড়েন।

অতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ।
ব্রহ্ম হৈল মহ'মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর*
আদম** হৈল সুলপাণি ।
গনেশ হইআ গাজী কাত্তিক হৈল কাজী
ফকির হইল অত মুনি ।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা ।***
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ।
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিহু' হৈল্যা হায়া বিবি****
পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর ।
অতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল আজপুর ।
দেউল দেহারা***** ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে****** বোল ।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ।

ধর্মঠাকুরের নেতৃত্বে হিন্দু দেবদেবীরা যবন দেবদেবী রূপ ধারণ করিয়া অত্যাচারী ব্রাহ্মণদের জাতি নাশ করিয়া, মন্দির ও দেবগৃহ ভাঙ্গিয়া তাণ্ডব শুরু করিলেন ।

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন
সাজাইলে আজপুরে হইয়া যবন ।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়
হাতে পুথি কর্য্যা কত দেয়াসি পালায়
ভালের তিলক যত পুঁছিয়া ফেলিল
ধর্মের গাজনে ভাই যবন আইল ।

* পয়গম্বর ** আদম *** মওলানা **** আদি নারী (Eve)
***** দেহারা = ছোট মন্দির, দেব গৃহ ****** পাঠান্তর "আল্লা", পাখড়পাখড় = পাকড়ো পাকড়ো অর্থাৎ ধর, ধর ।

নেউল দেহারা যত ছিল ঠাই ঠাই
শুয় করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই ।
ধর্মের পাজনে ভাই উড়িছে বলকা
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতাকা ।

অষ্টাদশ শতকের আর একটি খণ্ডিত পুঁথিতে* (ভণিতাকার দ্বিজ শ্রীরাম পণ্ডিত) এই অত্যাচারের বর্ণনা আরও তীব্র ভাষায় করা হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন জাজপুরে প্রবেসিলা হইয়া জবন ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জন পথে নাগালি পায় তালের তিলক সব পুছ্যা পেলে পায় ।
জাতিনাশ করে কার মুখে দিয়া ছিবা মারয়া কাড়্যা খায় কার দিয়া পাড় দাবা ।
পাসান প্রতিমা ভাঙ্গে গো হৌড়ের ঘায় হাথে প্রাণ করয়া কত দেবালি পালায় ।

এই পুঁথির কবিতায় দেখিতেছি শুধু ব্রাহ্মণ নহে, বৈষ্ণবদিগের উপরেও অত্যাচার চলিয়াছে । বৈষ্ণবগণ ধর্মভক্তদের যে সুনজরে দেখিতেন না বৃন্দাবন দাসের লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কাজেই ধর্মঠাকুরের হাতে বৈষ্ণবদের নির্যাতিত হইবার কাহিনী রচনা করিয়া ধর্মভক্ত কবি বৈষ্ণবদের উপর একহাত লইয়াছেন ।

ইহার পর আছে পাশা সিংহের গল্প । নিপুণ পাশা খেলোয়াড় ব্রাহ্মণ পাশা সিংহকে পাশা খেলায় বারবার হারাইয়া দিয়া যবনবেশী ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণদের গোমাংস খাইতে বাধ্য করিলেন । ভীত ব্রাহ্মণগণ নতিস্বীকার করিলে পরিত্রাণ লাভ করিলেন ।

দ্বিজ শ্রীরাম পণ্ডিতের পুঁথির কাহিনীতে ব্রাহ্মণদিগের পরিত্রাণ লাভের কথা নাই । এই পুঁথির কবিতায় পরিষ্কারভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিরঞ্জনের আরাই সৃষ্ট । হিন্দু আগে, পরে মুসলমান—এই মাত্র তফাৎ । "আগু হয়্যাছে হিন্দু পাছু মোছলমান হিন্দুকে পুরাণ দিল জবনে কোরান ।" জাজপুরে যবনরূপী ধর্ম-ঠাকুরের আবির্ভাবের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল । উল্লুক বা হনুমান খুব ধরাপড়া করায় ধর্মঠাকুর অধাই-করা গাজীদের জীবন দান করিলেন ।

---

* পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড—শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, : ৭৬-৮১

পাশা সিংহ খেলায় হারিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে যবনরূপী ধর্মঠাকুর ("অটক আমার নাম জাত্যেতে যবন") ক্রুদ্ধ হইলেন।

বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন যৌতুকে তিনভাগ রাজ্যপুর করিব তুড়ুক। সমস্ত ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া আনা হইল। মওলানারূপী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা মিলিয়া দশটি গাভী জবাই করিলে নুরবিবিরূপিণী পদ্মা গোমাংস রন্ধন করিবেন। ইহার পর ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইল। খানা খাইবার ডাক পড়িল—

তা শুনিঞা মহাপ্রভু আনন্দিত হইল
হাজাম করিয়া সৃষ্টি বামনে সুনত দিল।
মাথা মুড়াইয়া টুপি দিলেন মাথায়
মুরিদ করিয়া কলিমা সিখাল্য সভায়।
আনিঞা করার পানি ধোয়াইল হাথ
বামনে জবন করে দুনিয়ার নাথ।

প্রভু নিরঞ্জন এইভাবে মুসলমান সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কাজটা উদ্ধুক বা মুসমানের ভাল লাগে নাই। প্রভুর বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তিনি চমৎকৃত, তবু কাজটা তো ভাল হইল না।

তুমি প্রভু নিরাময় তোমারে উচিত নয়
তবে কেন এত অবিচার
বহিতে করিছে ত্রাস বিপ্রগণে কৈলে নাস
এ নহে তোমার ঠাকুরাল।

ব্রাহ্মণগণ জব্দ হওয়ায় ধর্মভক্তগণ খুশীই হইয়াছিলেন। মুসলমান শাসকদের অত্যাচারকে তাঁহারা দেবতাদের শাস্তিবিধান বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মুসলমানদের ব্রাহ্মণদলনের সাফাই গাহিয়া ছিলেন, কিন্তু গোহত্যা বরদাস্ত করিতে তাঁহারা রাজী ছিলেন না। তাই উল্লুকের মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা শুনাইয়া ধর্মঠাকুরকে নিহত গাভীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

হরিদাস পালিত সংগৃহীত "ধর্মপূজা পদ্ধতি", এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "ধর্মপূজা বিধান"। সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ' প্রভৃতি পুঁথি ও গ্রন্থে রাজপুর কাহিনির মেহারাভঙ্গগীত, বড় আলাসী প্রভৃতি ছড়ায় ব্রাহ্মণ নির্যাতনের কাহিনীগুলি নিম্ন কোটির মানুষদের দেবদেবীদের প্রতি

ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার মুসলমান শাসকদের সন্তুষ্ট করিয়া নিজেদের দেবদেবীর পূজা নির্বিঘ্নে চালু রাখার উদ্দেশ্যও ধর্মভক্তদের হয়তো ছিল। উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও ঘৃণা এবং মুসলমান শাসকদের বিরূপতা এই দুই জাতাকলের মধ্যে পড়িয়া প্রাগার্য দেবদেবীদের ভক্তরা সুকৌশলে নিজেদের পূজানুষ্ঠানকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে ইহা একান্তই স্বাভাবিক। হরিদাস পালিত মহাশয় তাঁহার 'আন্তের গম্ভীরা' গ্রন্থে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

"নিরঞ্জনের রুষ্মা" (উষ্মা) আদর্শ পুঁথিতে ছিল না, বাংলা সরকারের সংগৃহীত অর্বাচীন পুঁথিতে ছিল—এই কথা "শূণ্যপুরাণে"র সম্পাদকদ্বয় বলিয়াছেন। "নিরঞ্জনের রুষ্মার" অনুরূপ একটি ছড়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত একটি তালপাতার পুঁথিতে পাওয়া যায়। এই ছড়ার নামটি একেবারেই মুসলমানী--"কলিমাজারাল"। এই ছড়াটি শূণ্যপুরানের" "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক ছড়ার পাঠান্তর বলা যাইতে পারে। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিটি "ধর্মপূজাবিধান" নামে ১৩২৩ সালে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। "ধর্মপূজাবিধানের" কোন কোন ছড়ায় ধর্মঠাকুরের পূজায় বৌদ্ধ ও ইসলামের প্রভাব লক্ষিত হয়।

স্পষ্টতঃই পুরীর জগন্নাথ দেবের উল্লেখ করিয়া একটি ছড়ায় বলা হইয়াছে:

জলধির তীরে স্থান বোদ্ধরূপে ভগবান
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন।
প্রসাদ করেতে দিয়্যা নরে সন্নিধান লিয়্যা
কৈলে তুমি নৈরাস গমন। (ধর্মপূজাবিধান পৃঃ ২০৮)

আর এক স্থলে বলা হইয়াছে।

দলমুরুতে গোসাঞি বলালে জগর্নাথ।
নিমের পৃতিম গোসাঞি সুবর্ণের হাত॥
হিন্দু মুছলমান তোমা একছত্র করিঞা।
আপনা আনান প্রভু আনান জানিঞা॥
হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মজা।
গৌড়েতে বলেন গিয়া ধর্ম মহারাজা॥

(ধর্মপূজা বিধান, পৃঃ২১৪)

"কলিমাবাজালের" প্রায় সমস্ত ছড়াটিই ফারসী ও বাংলার সংমিশ্রণে লেখা। যেমন,—

সুরৎ ঘোড়াকা পিঠে জিন্ পালান্।
বার দিয়া বসিলেন খোদায় পরমান্॥

অথবা,

হাঁস জভেকে মুরগ জভেগো বকরাবকরি গাই।
মুরগকা পেট মোজোব অদাফ
উনকো জবাই কোন ঠাঞি।

• • • •

পান, সোপারি খায়ে বিবি।
খানা পাকালে চড়ায়ে ডিবি॥
আসমান্ পর খোদায়ে খাড়া।
হুজুরকীয়ে তাস মহেড়া॥
এ সব খানা খায়েনা হোয়ে।
খোদায় খনকারে হুকুম নিয়ে॥
গাই হাম্বা বকরা ডাকে।
মুরগা মুরগি কুকুরে বাঙ্গ॥
মচলি চল গেয়ে পথুরি গাঙ্গ॥

• • • •

রামাই কহে কবি আন্।
হারাম কো উপর হালল কো খান্॥
জেতা লোক বৈঠ কহ রামকা নাম॥
আদ্দিকা পণ্ডিত রামাই কহে।
এ বাত জুদা নহে॥

এর পরেই আবার সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠান বিধি, যেমন, "হংসকবুতরেণ বা বদ্ধা গৃহমগ্নংকুর্য্যাৎ", ইত্যাদি।

বাংলা, ফারসী ও সংস্কৃত এই তিন ভাষার বিচিত্র সংমিশ্রণে রচিত এই সব গাথা বা ছড়ায় পাঠান মুঘল আমলের বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও মিলনের এক বিচিত্র ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে আবার এই ছবির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধের একটি অস্ফুট ছবি।

কিউবা বিপ্লব ঃ সংগ্রামী অতীত

ভানুদেব দত্ত

কিউবা বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির পর দুটি দশক কেটে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ও ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লব যেমন বিশ্বজুড়ে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ১৯৫৯ সালে কিউবা বিপ্লবের সাফল্য ঐ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করেছে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নব্বুই মাইল দূরে অবস্থিত এই দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সমাজতন্ত্রের পতাকা সেখানে উড্ডীন রয়েছে। বিশ্বসমাজতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য জয়যাত্রার ও বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অবিরাম অগ্রগতিতে কিউবা বিপ্লব প্রভূত অবদান রেখেছে।

কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে শংকিত কারো কারো মতে এটি হল এক আকস্মিক ঘটনা বা "মতাদর্শশূন্য বিপ্লব"। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই বক্তব্যগুলির পেছনে রয়েছে—সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটানো এবং বিশ্বজোড়া মতাদর্শের সংগ্রাম থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে এসে "মতাদর্শ পরিহারের তত্ত্ব" প্রচার করা। অথচ এই বিপ্লবের কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে একটা নিয়ম এবং তা হল, মানবসমাজের ইতিহাসের নিয়ম। আর এই বিপ্লবের ঐতিহ্য হিসাবে রয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে কিউবার জনগণের আত্মত্যাগদীপ্ত সংগ্রাম। কিউবা বিপ্লবের সাফল্য অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এক বৈজ্ঞানিক ও সার্থক পরিণতি।

রুশ মহাবিপ্লবের পূর্বাবস্থা

কিউবা বিপ্লবের উৎস ও ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রো উল্লেখ করেছেন, "এই সংগ্রাম চলেছে প্রথমে স্পেনীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং তারপরে, গত শতাব্দীর শেষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ববন্ধনের বিরুদ্ধে, যখন জাতীয় মুক্তি অর্জনের ব্রতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের উপরে

মানুষের শোষণ নিশ্চিহ্ন করার ব্রত।"* এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছেন কিউবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া জাতীয়বাদী ধারা ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধারার অস্তিত্বের কথা। বস্তুত: এই দুই ধারা কিউবায় তো বটে, লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশেও বিদ্যমান ছিল। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারা, বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা এবং যার বিকাশপথে এল সমাজতান্ত্রিক ধারা— এইভাবেই কিউবার বিপ্লবী প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছিল। এই ধারাগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধারাটি ১৯১৭ সালের রুশ মহাবিপ্লবের পূর্বেই ভ্রূণাকারে লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের মতো কিউবায়ও সেটি এক মূর্তরূপ ধারণ করেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কিউবায় আগমনের ফল হিসেবেই স্পেনীয় উপনিবেশবাদের গোড়াপত্তন হয়েছিল। খনিতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, জমি থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ এবং কিউবার নিজস্ব শ্রম-সম্পদ ব্যবহারের পরিবর্তে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা শ্রমসম্পদের ব্যবহার— এই ছিল উপনিবেশবাদীদের কাজ। আফ্রিকা থেকে সে সময় প্রায় ৬ কোটি নিগ্রোকে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে চালান করা হয়েছিল। ফলে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে, নিগ্রোজাতি প্রায় বস্তুত: লুপ্ত হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে যে, এইভাবে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের উপর উপনিবেশবাদীরা চালিয়েছিল এক ধরনের বর্বর।** লাতিন আমেরিকায় তারা চালালো লুণ্ঠন ও হিংসা।*** সেখানকার অর্থনৈতিক জীবন হল বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত।****

উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে স্পেনীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দাসত্ব বিরোধী সংগ্রাম। ১৮২০-৩০,

---

* কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিবেদন।

** A History of Cuba by Philip S Foner, Vol I, P 47. Quoted from W, E, B. Du Bois. Black Folk : Then and Now, New York, 1939, P 142.

*** Plunder and Violence was the sole aim of the Spanish Adventurers—Karl Marx.

**** The Spanish conquest cut short all further independent development—Frederick Engles.

১৮৩২, ১৮৩৫—৩৮ সালগুলিতে কিউবার বিভিন্নস্থানে এই ধরনের অনেক সংগ্রাম সংঘটিত হয় যার অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ঘটেছিল চল্লিশ দশকে। সংগ্রাম আরো উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল ১৮৬৮-৭৮ এই দশ বছরে। এটি ছিল কিউবার প্রথম স্বাধীনতার লড়াই এবং কিউবার ইতিহাসে এটি Ten Years' War নামে পরিচিত। "বহু দিক থেকেই, দশক-ব্যাপী এই যুদ্ধ স্পেনীয় স্বৈরতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিপ্লবের নিরীক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।* লক্ষণীয় যে, এই সমস্ত সংগ্রাম বা আন্দোলন বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয় নি। এগুলি সবই পরিচালিত হয়েছিল কৃষক ও শহরে মধ্যবর্তী স্তরের নেতৃমণ্ডলী দ্বারা।

কিউবা কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ প্রখ্যাত নেতা ব্লাস রোকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "……আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ব্যাপক সামাজিক পটভূমি ছিল। এর নেতৃত্বে ইক্ষু মালিকেরা ছিল না, ছিল কৃষক ও শহরে মধ্যবর্তী স্তর থেকে আগত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের দ্বারা যারা কেবলমাত্র স্পেনীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, তা নয়, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রম-আবির্ভূত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।"**

এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—এ্যান্টনিও ম্যাসিও ও জোসে মার্তি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিউবায় চলছিল এবং যে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু করেছিল সামন্তবাদকে ধ্বংস করা ও স্পেনীয় উপনিবেশবাদের অবসানের জন্য, সেই আন্দোলনের অভ্যন্তরস্থিত একটি ধারা এঁদের নেতৃত্বে আরো শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করেছিল।

এ্যান্টনিও ম্যাসিও ছিলেন দাসত্ববিরোধী সংগ্রামের নেতা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন দাসব্যবস্থার অবিলম্বে অবসান ব্যতীত স্পেনীয় সম্রাটের সঙ্গে কোন চুক্তি বা কোন রকমের সংস্কার যথার্থ সুখ ও শান্তি আনতে পারে না। তাই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন স্পেনীয় সম্রাট কর্তৃক প্রস্তাবিত "জানযন্ চুক্তি" (Pact of Zanjon) কে। এ্যান্টনিও ম্যাসিওর এই প্রত্যাখ্যানই ইতিহাসে 'বারাগুয়া প্রতিবাদ' (Protest of Baragua) নামে খ্যাত হয়ে রয়েছে।

*A History of Cuba by Philip S. Foner, Volume II, P-275,

** Historic Significance of the] Cuban Revolution—Blas Roca.- Problems of National Liberation, Vol 2, No 1

জোসে মার্তি ছিলেন একজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী। তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন মার্কস, এঙ্গেলস, সাইমন বলিভার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। সে যুগে সাইমন বলিভারকে লাতিন আমেরিকার 'মুক্তিদাতা' বলে অভিহিত করা হত এবং এখনও তিনি সেই উচ্চাসনে আসীন। বলিভারের গণতান্ত্রিক চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকে তাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩০ সাল পর্যন্ত তো বটেই, এমনকি তার পরেও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। জোসে মার্তি ছিলেন সাইমন বলিভারের উত্তরসূরী। কিউবার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে প্রবহমান অধিকতর বিপ্লবী স্রোতধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ছাপিয়ে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ধারা জোসে মার্তির সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রচণ্ড এক গতি পেয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর গণতন্ত্র ছিল সাধারণ মানুষের জন্য, তা ছিল বৈপ্লবিক গণতন্ত্র। মার্তির একমাত্র লক্ষ্য ছিল—"বিশ্বের দরিদ্রদের সঙ্গে আমি আমার ভাগ্যকে মেলাতে চাই এবং একটা নতুন বিশ্ব, শ্রমজীবীদের হাতে গড়া একটা নতুন বিশ্ব আমাদের সামনে এসেছে।"*

অতীতের অসংখ্য বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও যুদ্ধের ফলাফল থেকে জোসে মার্তি এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন যে, কিউবার সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সামাজিক সমাধান ছাড়া করা সম্ভব নয়।** তাঁর এই বোধকে কাজে রূপায়িত করার জন্য তিনি পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ফলে তিনি ১৮৯২ সালে কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি গঠন করেন। রুশ সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পূর্বে বলতে গেলে এটিই ছিল কিউবার এক প্রধান রাজনৈতিক পার্টি। এই পার্টি ছিল বস্তুতঃ এক বিরাট মঞ্চ। এতে মার্কসবাদী, কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রী এবং নৈরাজ্যবাদী সকলেই ছিলেন।

১৮৯৫ সালের শুরুতেই শুরু হয়ে যায় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধের প্রকৃত শত্রু কে, মিত্রশক্তি কারা, যুদ্ধ পরবর্তীকালে দেশের সম্ভাব্য চেহারা কি হতে পারে এসবই মার্তি নিখুঁতভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি মনে করতেন ১) স্বাধীনতার যুদ্ধ হবে সভ্য; ২) জয়লাভের জন্য নিগ্রোদের অংশগ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং নিগ্রো জাতটা ভয়ের কারণ এই অভিযোগ আসলে বিপ্লবের ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্য স্পেনীয় শাসনের সুফলভোগীদের

* A History of Cuba—By Philip S. Foner vol II, P 329

** Ibid P 319

শয়তানী প্রচার : ৩) লড়াই-এর বাইরে রয়েছে এমন স্পেনীয়রা কখনোই প্রতিহিংসা, ভীতি প্রদর্শন এবং স্বীকার হবে না ; ৪) বিপ্লবকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না এমন সব বেসরকারী গ্রামীণ সম্পত্তিকে রক্ষা করা হবে ; ৫) বিপ্লব কিউবাতে এক নতুন অর্থনৈতিক জীবন এনে দেবে।*

দুঃখের বিষয়, জোসে মার্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই স্পেনীয় উপনিবেশবাদীদের দ্বারা নিহত হন। জোসে মার্তির মৃত্যুর পর কিউবার রাজনৈতিক জীবনে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথমত, স্পেন উপনিবেশবাদের পতনের পর (১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত দিক থেকে কিউবাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকেই বস্তুত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হয়ে পড়ে। সারা দেশজুড়ে নেমে আসে সংকট ; উদ্ভূত হয় নানান ধরনের সমস্যা। দ্বিতীয়ত, জোসে মার্তির মৃত্যুর পর কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে যে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়ত, দেশের মানুষের আশা ও আকাঙ্খাকে কেন্দ্র ক'রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাহিদা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার পাশাপাশি কিউবান রেভলিউশনারী পার্টির শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ক্রমেই প্রকট হতে থাকে।

এর সঙ্গে একথাও সত্য যে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এই পার্টির অভ্যন্তরে অধিকতর বিপ্লবীধারার অনুগামীবৃন্দ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এমন সময় ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব তাঁদেরকে পথ দেখালো। এই মহাবিপ্লবের মহান আদর্শ এই পার্টির বহু বিপ্লবীকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল। এইভাবেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভ্যন্তর থেকেই সমাজতান্ত্রিক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। রুশ বিপ্লব ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ধারাপথে শ্রমিক আন্দোলনের স্রোতও শক্তিশালী হয়েছিল। এই সময় যে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কিউবান শ্রমিকদের জাতীয়

* Ibid P 329

কনফেডারেশন (National Confederation of Cuban Workers), জাতীয় ইক্ষু শ্রমিক সংস্থা (National Sugar Workers' Union) ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ক্রুশ অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে কিউবায় দু'টি ধারা বিদ্যমান ছিল—বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা। হোসে মার্তির জীবদ্দশায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার অভ্যন্তরে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার উন্মেষ ঘটেছিল। তবে তাঁর মৃত্যুর পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তখন একদিকে আমরা দেখি বিপ্লবী গণতন্ত্রের শক্তিহীনতা এবং অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ধারার পুনঃ শক্তিবৃদ্ধি।

অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা

এই মহাবিপ্লবের ঠিক পরবর্তীকালে কিউবায় দুটি ধারার অস্তিত্ব ছিল। প্রথমটি হল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা (কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি) এবং দ্বিতীয়টি হল বিপ্লবী গণতন্ত্রের ধারাপথে সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক ধারা (পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি)। এঁদেরই উদ্যোগে Socialist Association of Havana দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য হওয়ার ধারাগুলি গ্রহণ করেছিল এবং Socialist Association এর পরিবর্তে Communist Association নাম গ্রহণ করে বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এই সংগঠন গুলির মিলনের ফলে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টি। এটি ছিল সেই সময় একমাত্র মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি এবং আজকের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরী। এই সমাজতান্ত্রিক ধারার অন্যতম ছিলেন—জুলিও এ্যান্টনিও মেল্লা কার্লো বালিনো।

কিউবা বিপ্লবে এই পার্টির ভূমিকাকে ফিদেল কাস্ত্রো সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে বলেছিলেন—"বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লবের বিচ্ছুরিত আলোয় বালিনো মেল্লার সেই গৌরবমণ্ডিত সময়ে যাঁরা কাজ করেছিলেন, সেই কমিউনিস্টদের ধৈর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক কাজ, অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার প্রসারকে সহজতর করেছে, যাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল

এমন বহু তরুণের কাছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাকে এক আকর্ষক ও অকাট্য তত্ত্বে পরিণত করার কাজ সহজতর করেছে।"*

ত্রিশ দশকের সংকটকালে কিউবার সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ যখন চরমে উঠেছে, শ্রমিকদের ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, সেসময় এই সমস্ত সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার ব্যাপারে কিউবার কমিউনিস্টরা এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিউবার ত্রিশ দশকের পরিস্থিতি ছিল—"এই সময়টি চিহ্নিত হয়ে রয়েছে পর পর ঘটে যাওয়া ধর্মঘট দিয়ে, জুতা, বস্ত্র, টুপি, এবং অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকরা ক্ষুধা ও নিপীড়নবিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল···, অবাধহিত রাজনৈতিক লক্ষ্য মিলে মিশে গিয়েছিল শ্রমিকদের প্রতিরোধী তৎপরতার সঙ্গে··· বিপ্লবী আন্দোলন প্রসারের লক্ষণ হিসেবে গ্রামাঞ্চল ও শহরগুলিতে অভ্যুত্থান ঘটছিল।"** এই সমস্ত বিক্ষোভ, আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল রেল ও কারখানার শ্রমিকেরা, দোকান ও অফিসের কর্মচারীরা এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এই ব্যাপক সম্প্রদায়ের মানুষকে অংশগ্রহণ করানোর মূলে ছিল কমিউনিস্টরা। এইভাবে কিউবার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ম্যাচেডোর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এক ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

পপুলার সোস্যালিস্ট পার্টির নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন এই সমস্ত আন্দোলনের অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক ধারার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল, অন্যদিকে এরাই আবার আন্দোলনে ব্যাপকতা ও গভীরতা আনার জন্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করেছিল। এই ধারা ক্রমে ক্রমে শক্তি অর্জন করলেও, তখনও পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হতে পারে নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারার অনুসারী ছিল কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি। যদিও এই পার্টি জোসে মার্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তথাপি এটি ছিল এক বিরাট মঞ্চ যার সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে সেখানে জড়ো হয়েছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ

---

* কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ফিদেল কাস্ত্রোর প্রতিবেদন।

** Economic History of Cuba—By Julio Le Riverend p 244.

এসত্ত্বেও এই পার্টির অভ্যন্তরে এক উদারনৈতিক ধারা ছিল। ১৯৪৬ সালে এই ধারার অনুগামীবৃন্দ কিউবান রেভলিউশনারী পার্টির দেউলিয়া ও বন্ধ্যা-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এঁরা ছিলেন উদারনৈতিক পেটি-বুর্জোয়া সম্প্রদায়। এরা শেষ পর্যন্ত কিউবান রেভলিউশনারী পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে কিউবান পিপ্‌ল্‌স পার্টি গঠন করলেন। এটি 'অর্থোডক্স পার্টি' নামেও পরিচিত। একথা ঠিক যে কিউবার সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উপলব্ধি 'অর্থোডক্স পার্টি'র সদস্যদের মধ্যে না এলেও, দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং দেশের প্রধান শত্রু যে সাম্রাজ্যবাদ এই বোধ তাঁদের মধ্যে ছিল।

কিন্তু কিউবার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বাতিস্তার দুর্নীতি ও কুশাসন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব কিউবার বুকে এমন ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, কিউবান পিপ্‌ল্‌স্‌ পার্টিও এর বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারল না। বাতিস্তা কর্তৃক নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এই পার্টি পেটিবুর্জোয়াসুলভ দোদুল্যমানতা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করল। এই দলের একটি অংশ এইসব বৈশিষ্ট্যের শিকার না হয়ে বাতিস্তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করার জন্য ১৯৫২ সালে পার্টির সংস্রব পরিত্যাগ করল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র কিউবাবাসীর ধূমায়িত আক্রোশকে এঁরা উপেক্ষা করতে পারল না। এরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নিল। এরা বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে নি, তবে এই দলটি পরবর্তীকালে '২৬শে জুলাই আন্দোলন' নামেই পরিচিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই তারিখেই এই দলটি মনকাডা দুর্গ অভিযান সংঘটিত করে।

এই দলটি ছিল জোসে মার্তির মতাদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতি অনুগত। ১৯৫৩ সাল যেহেতু মার্তির শতবার্ষিকীর বৎসর, সেই কারণে এই দলের যুবকেরা নিজেদেরকে শতবার্ষিকীর প্রজন্ম বলে মনে করত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে তাঁদের যৎসামান্য ধারণা ছিল। এরই ভিত্তিতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল—কিউবার অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট কত গভীর এবং এর সমাধানের রাস্তাই বা কি। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাতিস্তা শাসনের বিরুদ্ধে যেখানেই কোন সভা করেছে, এই সমস্ত বিপ্লবী যুবক সেখানে অংশগ্রহণ করেছে এবং

প্রতিটি বিস্ফোভের পুরোভাগে থেকে তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে।

"২৬শে জুলাই আন্দোলনের" নেতৃত্বে ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। এই দলটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তি সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই শক্তি দ্বারা গঠিত "বিপ্লবী বাহিনী"টি ছিল "বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র।" এই বিপ্লবীবাহিনীর অনলস প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, শহরে মধ্যবর্তী সম্প্রদায় এবং সবশেষে সমগ্র জনগণের মধ্যে এক বিপ্লবী ঐক্য তৈরী হয়েছিল। সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে এই বাহিনী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলেই, সংগ্রামের বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করা গেছিল। বাতিস্তার ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেবল গেরিলা কায়দা ব্যবহৃত হয় নি। এটি মুখ্য হলেও, এর সঙ্গে অন্যান্য ধরনের সংগ্রামও যুক্ত ছিল। যেমন, শ্রমিকশ্রেণীর বড় বড় ধর্মঘট, ছাত্র বিস্ফোভ, নির্বাচন বয়কট, গণবিস্ফোভ ইত্যাদি। এই ভাবেই এসেছিল কিউবা বিপ্লবের সাফল্য।

প্রসঙ্গত, এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে কেবল মাত্র '২৬শে জুলাই আন্দোলন' রয়েছে, তা নয়, সঙ্গে রয়েছে অন্যদল বা শক্তি। ফিদেল কাস্ত্রো, নিজে এই সাফল্যের রূপকার হয়েও, অন্য পার্টির অবদানকে তুচ্ছজ্ঞান করেন নি। তিনি বলেছেন—"শুধু যে ২৬শে জুলাই-এর আন্দোলনের দরুনই তা অর্জিত হয়েছিল, তা নয়। যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির কর্মীবাহিনীর মধ্যে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ ছিল, সেই পার্টি তার বহু সন্তানের রক্তে তার মূল্য দিয়েছিল, এই সন্তানরা প্রাণ দিয়েছিলেন বিজয়ের জন্য।" এই দুটি দল ছাড়াও আরো একটি দলের অবদানও অকিঞ্চিৎকর নয়। কাস্ত্রো তাদের কথাও সম্ভ্রম-সহকারে উল্লেখ করেছেন। এই দলটি হল 'বিপ্লবী ডিরেক্টরেট।' এর সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীরা কিউবা বিপ্লবের জন্য বহু বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। যেমন ১৩ই মার্চ, ১৯৫৭ তারিখে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের উপর আক্রমণ, গেরিলা সংগ্রামে অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এই তিন ধারা একদিকে যেমন কিউবা বিপ্লবের সাফল্য এনেছে, অন্যদিকে তেমনি বিপ্লব-পরবর্তীকালে তাদের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি।

সুতরাং দেখা যায় যে, কিউবা বিপ্লবের সাফল্যে কোন আকস্মিকতা নেই, রয়েছে ইতিহাসের এক ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতার জন্যই কিউবার

কমিউনিস্টরা আজও পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধায় একদিকে যেমন স্মরণ করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে, অন্যদিকে স্মরণ করেন অতীতের জাতীয় বীরদের। বর্তমানকালের বিপ্লবীরা যে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের কাছে ঋণী একথা ফিদেল কাস্ত্রো নিজেই স্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন দ্বিধা পোষণ না করে তিনি এও বলেছেন যে, এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ ও অতুলনীয় বীরত্বের বীজ মার্তি, ম্যাসিও, গোমেজ, আগ্রামন্তি, সেস্‌পেদেস্‌ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই প্রোথিত হয়েছিল। কিউবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যের এরাই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা।

বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথ থেকে সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণ—এই হল কিউবা বিপ্লবের মর্মকথা।

(আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে :
'কিউবা বিপ্লব-তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য')

কোংকনী লোকগীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

শম্ভু মিত্র

১৫১০ থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫১ বছর গোয়ায় রাজাশাসন করছে পোর্তুগীজরা। পোর্তুগীজরা এদেশে এনেছিল রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। ঔপনিবেশিক শাসন ও গীর্জার প্রসারের সংগে সংগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও কৃষ্টি গোয়ায় এসেছিল তাদের মাধ্যমেই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে গীর্জা নির্মাণ ও নানা ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি পোর্তুগীজ ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য গীতিবাদ্য শিক্ষার প্রবণতাও গোয়ায় বিস্তারলাভ করে। গ্রামজীবন এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে নি, লোকগীতিতে পাশ্চাত্ত্য ধারা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এই কারণেই আজকের গোয়ার কোংকনী লোকগীতিতে দেশী বাদ্য ঢোল, তবলা, করতালের সঙ্গে বেহালা, গীটার, ড্রাম ইত্যাদি বিদেশী বাদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। একদিকে আছে ওবি, জাগোর, খেল, কুনবি ও শিশুগীত, অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবজাত প্রেমগীতি মান্‌দো, ধুরপদ, এবং নাচুনীদের দেখন্‌নি। এ সব ছাড়াও আছে ঋতু পরিবর্তনের গান, সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক ঘটনা, শ্রেণী ও জাতিভেদের গান। সত্যি বলতে কি, ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলের লোকগীতিতে দেশী ও বিদেশী সুর ও বাদ্যের এমন বিচিত্র সমন্বয় দেখা যায় না।

গোয়ায় পোর্তুগীজ শাসন কায়েম হবার পর ক্রীশ্চান মিশনারীদের চেষ্টায় গ্রামবাসীরাও ভক্তিকাব্য ও ভক্তিগীতিতে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। গোয়ার স্থানীয় লোকছন্দেই মিশনারীরা কাব্য রচনা শুরু করেন। সে সময় গোয়ায় ধর্মবিষয়ক ও সমাজগত নানা ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম ছিল ওবি (এক ধরনের কবিতা রচনার আংশিক যা সুরসহযোগে গাওয়া হত: বর্তমানে লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের প্রথম ইংরেজ জেসুইট মিশনারী টমাস স্টিফেন্স (১৫৪৯-১৬১৯ খ্রীঃ) তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্য "খ্রীষ্ট পুরাণ" ওবিতেই রচনা করেন। ওবিতেই ক্রীশ্চান ধর্মের সহজ সরল কথা, ক্রুশ, মাতা মেরী ও

বিভিন্ন সাধুসন্তের প্রশস্তি গাওয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজচিন্তার অন্যতম বাহন হল ওবি। খারবি (ছেলে) ও ভাণ্ডারীদের (চোলাই মদ প্রস্তুতকারী) মধ্যে ওবির জনপ্রিয়তা এখনো অটুট। গানের সংগে বাজনা হিসেবে থাকে মাদিয়েম, তমোত্ত (ঢোলের নাম) এবং করতাল। দলনেতাই ওবি গায়, মুখ্য বাজনদারও (এক্ষেত্রে মাদিয়েম বাজনদার) সে-ই। গাওনা ও ঢোল বাজানোর জন্য শিক্ষণ ও চর্চা একান্তই আবশ্যক। পিতা-পুত্র বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ওবি গাওয়া হয়। ঈস্টার, ক্রিসমাস, সেন্ট জন বা গ্রাম্য সাধুর সম্মানে আয়োজিত উৎসব, বিবাহ, সন্তানজন্মের ষষ্ঠ দিবস ইত্যাদিতে ওবি গাওয়া হয়। ওবি অনুষ্ঠানের সময়কে বোন্ন বলে (মাদিয়েমে লাগানর জন্য ছাই চালগুড়ির মিশ্রণকে বোন্ন বলে; এর থেকে উক্ত নামকরণ হয়েছে)। সন্ধ্যেয় বোন্নর আসর বসে; গাইয়ে বাজিয়েরা ঘুঁটে ও নারকেল ছোবড়া দিয়ে আগুন জ্বেলে আসরে বসেন। আগুনের আভায় ওদের মনে রং ধরে—ক্রুশ বন্দনা দিয়ে গান শুরু হয়। তেরে কেটে তাক তেরে কেটে তাক তাক তাক ঝিগিন ঝিগিন বাজে মাদিয়েম—একবার গানের বোল শোনা যায়। তারপর দ্রিমিকি দ্রিমিকি ঢোল বাজে।

সান্তা খুরসাচী কুরু (ক্রুশ চিহ্ন) ভক্তিমূলক ওবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই গানে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ক্রুশের মহিমা কীর্তিত হয়। বড়দের সংগে ছোটরাও কপাল, বুক, মুখ ও কাঁধে ক্রুশ এঁকে এই গান গায়।

প্রথমেই ক্রুশচিহ্ন আঁকি-বিশ্বাসের মূলে আছে ক্রুশ।/প্রথম ক্রুশটি আঁকি কপালে আগুন।/কপালে ক্রুশ আঁকার অর্থটি কি?/কুভাবনা মন থেকে সরাচ্ছেন নিয়ত ঈশ্বর।/দ্বিতীয় ক্রুশটি আঁকি মুখের ওপর।/মুখে ক্রুশ আঁকার অর্থটি কি?/মন্দ বাক্য মুখ হতে সরাচ্ছেন নিয়ত ঈশ্বর।/তৃতীয় ক্রুশটি আঁকি নিভৃত এ বুকে/বুকে ক্রুশ আঁকার অর্থটি কি?/কুইচ্ছা এ বক্ষ হতে সরাচ্ছেন নিয়ত ঈশ্বর।/চতুর্থ ক্রুশটি আঁকি কপাল, মুখ, বুক, দুই কাঁধে/কপাল হতে কাঁধ অব্দি ক্রুশের অর্থ কি?/কুচিন্তা, কুকথা, কুইচ্ছা সবকিছু ঈশ্বর রাখেন দূরে দূরে।/ তুমিই রক্ষাকর্তা, রাজা।

সুর ও কথার বৈচিত্র্যে এই ধরনের ওবি গান অসংখ্য ছড়িয়ে আছে গোয়ার পল্লী অঞ্চলে। এই সব ওবি গানে ধর্মযাজকের অনুমতি লাগে না। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে আপন মনের খুশিতে গেয়ে চলেন গ্রামবাসীরা। এই ধরনের গানের আরেকটি নমুনা: হে রোজারী, দয়া কর/তোমায় স্মরে

মালা জপি/আমরা পাপী, ক্ষমা কর/ গানের সংগে সংগে গাইয়ে বাজিয়েরা ফেন্‌নি (ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফেন্‌নি নামক মদ খান গোয়াবাসীরা) খান। গানের সুরে ও ফেন্‌নির উন্মাদনায় শরীরমন মেলে দেয় খুশির ডানা। এবার ধর্মীয় ভাব ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত সমস্যা ও সামাজিক রীতিনীতিমূলক লোকগীতিতে পরিণত হয় : ঘরে একগুচ্ছ সুন্দর ফুল এনেছিলাম/নাতালিনার জন্য, তাকে দেব ব'লে।/ মনে হল কেউ নাতালিনাকে ডাকছে/হায়রে, টাঙিখানা পাথর কাটতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে আছে।

শিশুমাতা মেরীকে গোয়ার ক্রীশ্চান সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি গ্রামাগীর্জার মেরীর জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট থাকে। তাঁর সম্মানে বার্ষিক অনুষ্ঠানও হয়। মেরী নানা নামে ভূষিত হন—মাউন্টের দেবী, রোজারীর দেবী, করুণার দেবী, অতি প্রাকৃতের দেবী, মূর্তিমতী নিষ্কলুষতা ইত্যাদি—তিনিই পাপী ও যিশুর মধ্যে যোগাযোগরক্ষাকারিনী। তাই কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান তাঁর প্রশস্তিতে গাওয়া 'লাদাইন্‌হা' প্রার্থনাগীত ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। মেরীর প্রশস্তিগীতি গোয়ার কোংকনী ক্রীশ্চান সমাজে এতই সুপ্রচলিত যে, যে কোনো শিশু এই ভক্তিগীতি সুর সহযোগে গাইতে পারে : হে দয়ার দেবী, করুণার রাণী/আমাদের আত্মনিবেদন/ভুলো নাগো মাতা।/দয়া করো মাগো/.তোমার সন্তানে কর ক্ষমা/স্বর্গ-উপহার হতে/যেন বঞ্চিত না হই। সেপ্টেম্বরের শুরুতে মাউন্টের দেবী নবেনা। উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধহয়ে গীর্জায় মেরীর বেদী ফুলে ফুলে ভরিয়ে ব'লে ওঠে : যিশুমাতা, তুমিই সহায়/দয়া করো মাগো, মনে শান্তি দাও।

মেরীর পরই যিশুর মৃত্যুর প্রতীক পবিত্র ক্রশের মাহাত্ম্য গোয়ার লোকগীতিতে সর্বাধিক প্রচলিত। পবিত্র ক্রশ,/তোমার আরেক নাম মরণ শয়ন,/তোমাকে করি নমস্কার। এ ক্ষেত্রে ক্রশ যিশু ও পরিত্রাতার প্রতীক রূপে কল্পিত হয়েছে। লেন্ট উপলক্ষে এই গান প্রায়ই গাওয়া হয়ে থাকে।

গোয়ার ক্রীশ্চান মেয়েরা বিয়েতেও ভাব গেয়ে থাকেন। পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুসারে বিয়ে শাদী গীর্জায় অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রাক্-বিবাহ ও বিবাহোত্তর অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার দেশীয় রীতিনীতিকেই অনুসরণ করে। বিবাহসংক্রান্ত এই গানকে জোতি বা ভেব বলে।

বিয়ের আগে দিন ঠিক করে চুড়িওলাকে কনের বাড়ী ডাকা হয়। মাদুর বা সতরঞ্চিতে কনে বসে, তাকে ঘিরে থাকে বাড়ির মহিলা ও প্রতিবেশিনীরা। যখন চুড়িওয়ালা সবুজ কাঁচের চুড়ভো বা চুড়ি কনের দুই হাতে পরিয়ে দেন, (গোয়া, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশে সবুজ কাঁচের চুড়ি হিন্দু নারীর সধবা-ত্বের লক্ষণ বলে বিবেচিত : লক্ষণীয়, ক্রীশ্চান সমাজেও এই হিন্দুরীতি কেমন সহজে স্থান পেয়েছে। তখন মেয়েরা ঈশ্বর ও মেরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে কলস্বরে গেয়ে ওঠেন : মাপুসারই বাজার থেকে/কিনলাম এই চুড়ি।/মেরী মাতা গো, তোমার অশেষ/দয়ায় ভরা চুড়ি।/কার আদেশে তোমার হাতে/চুড়ি পরাই মেয়ে?/ ওপর হাতে যিশুর আশিস/পাবে তোমার হাতের চুড়ি /হাত দুটো চুড়ি দিয়ে আজকে মেয়ে দিলাম ভ'রে/স্বামীর ঘরে হাজার চুড়ি/এমনি পরিস দু' হাত জুড়ে।

বিবাহের পূর্বে বরবধূর গায়ে নারকেলের দুধ (গাত্র হরিদ্রার অন্যতর সংস্করণ ?) মাখান হয়। এই উপলক্ষে একদিন সন্ধ্যেবেলায় আত্মীয়-স্বজনেরা ওবি গেয়ে থাকেন। নারকেলেরই দুধে/সিক্ত করো বসন/মাথায় বসন রেখে/বরকে করি বরণ।/ দুধ নিঙড়ে নিয়ে/মাটীর সরায় রাখি।/ সোনার ছেলের মুখে/দুধটুকু আয় মাখি।

বিয়ের দিন গীর্জায় যাবার আগে বরকনেকে সাজপোশাক পরানোর ধুম পড়ে যায়।/বরের পোশাক পরার সময় ওবি গেয়ে ওঠেন তার আত্মীয়েরা : 'হ্যাট বুট কোর্ট পরো/পকেটে রুমাল/এবার চলো গীর্জা ঘরে/আনন্দে উচ্ছল। কনেকে সাজানোর সময় বলা হয় : জুতো গাউন পরো কনে/গীর্জা চলো খুশি মনে।

গীর্জায় বিয়ে শেষ হবার সংগে সংগে সকলের 'প্রাণে খুশীর তুফান' ছোটে। বরবধূকে অভ্যর্থনা জানান আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব। এই দিনটি শুধু নবদম্পতির কাছেই নয়, আত্মীয় বন্ধুর কাছেও স্মরণীয়। নবদম্পতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশেষ মঞ্চ তৈরি হয়। ওখানে সবাই মান, আজ "বিশ্বসাথে যোগে···বিহার" করার দিন। আম চুরির ঝগড়া লাভের খবরা নিয়ে মন কষাকষি, পরিবারে পরিবারে আসা-যাওয়া বন্ধ—আজ এই আনন্দের দিনে অতীতের তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে 'সবার রঙে রং

মেশাতে হবে।' আজ বরবধূকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ এবং ভালবাসা জানাতে হবে।

কনে কখন এসে গেছে/সন্ত মাইকেল, দয়া করো/দয়া করো, আসছ যারা/দয়া কর, হে ঈশ্বর।/ কনে কখন এসে গেছে/ দেরি কিসের তবে?/ বধূ সহ ঘরের ভিতর/শীঘ্র চলো কুমার।/ এই তো ছিলেন, কোথায় গেলেন/ কনের পিতামাতা?/ তোমায় করতে বরণ/ঐ যে আসেন কুমার তাঁরা।

বিবাহ উপলক্ষে মণ্ডামেঠাইসহ অন্যান্য যেসব খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করা হয়, সেসব খাদ্যের প্রস্তুতি চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। যে চাল অতিথিদের পরিবেশন করা হয়, তার ধান সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল করা হয়, পরে তা গুঁড়া করা হয়। এই প্রস্তুতিপর্ব শ্রমসাপেক্ষ তাই পরিশ্রম হালকা করার জন্য ওবি হাওয়া হয়: স্বর্ণ সুতোয় বোনা ঝুড়ি/তাতেই যে দুই জল/ পিত বিত্তর আশীর্বাদে/ধন্য হল চাল।/আসিদ্ধ এই চালের রাশি/ছড়াও দিকে দিকে/মেরী, ফুটুক তোমার দয়ায়/দুটি সবার মুখে। বর বা কনের বাড়িতে চাল গুঁড়ি থেকে বোদ্দে (চালের ছোট গোল পিঠে) বানিয়ে চাকা নারকেল তেলে ভাজবার জন্য একত্র জড় হয় গ্রামের মেয়েরা। এই পিঠে তৈরি করা বা ভাজার সময় ক্লান্তি দূর করার জন্যও গলায় গলা মিলিয়ে ওবি গান মেয়েরা।

বিবাহ সংক্রান্ত ওবি গানে প্রথমে ঈশ্বর, মেরী ও নানা সাধুসন্তের আশীর্বাদ চাওয়া হয়। এরপর বরবধূর গুণকীর্তন, সবশেষে দুই পরিবারের সমস্ত সদস্যের প্রশস্তি। সাধারণতঃ মেয়েরাই ওবি গেয়ে থাকেন। গানের পদ প্রায় ক্ষেত্রে ট্রাডিশনাল হলেও মুখে মুখে বাঁধা গানের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। পদবাঁধার প্রতিযোগিতা খুবই উপভোগ্য হয়ে থাকে। শোন, সবাই বলছে কনে/ মধুর গন্ধ, বাণী/ আমাদের এই রাজত্বের/ আজ হতে সেই-ই রাণী।/গাছে বাঁধা ঘোড়ার পিঠে/চড়ে ছিল যেজন/সেই আরোহীই বরযে হবে/সবার প্রিয় স্বজন।/চাঁদের কাছে জ্বলছে দেখ/আরেক উজল তারা/কোথায় তুমি চললে গো, বোন,/সবার সঙ্গ হারা?/যেমন খুশি আসবে যাবে/যখন খুশি ধনি/তোর শাশুড়ির অনেক আছে/যেন সোনার খনি।/সাদা এবং সবুজ সুতোয়/কয় পয়সা তোলা?/তোর পোশাকের পারাচুন্নী/করবে ভুবন আলা।

'জাগোর' গান তাড়ি প্রস্তুতকারক ও ধীবরদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রচলিত। জাগোর গাইবার জন্য অভিনয়যোগ্য মঞ্চ অপরিহার্য। অনুষ্ঠান শুরু হয় নিশুতি রাতে। চলে ভোর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের কিছু আগে গান-বাজনার মহড়া সেরে কুশীলবরা মঞ্চে ওঠেন। ব্রহ্মবন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এবার আসে প্রহসন অংশ—এই অংশে ব্যাংগ, শ্লেষ, নাচ, গান সবই থাকে। শ্লেষ বা নাচ গান প্রায়ই অশ্লীলতার রূপ নেয়। সোবোংগম ও শুদ্ধম গানে সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় কেচ্ছা কেলেংকারী সবই থাকে। জাগোরের উদাহরণ: সাত সাগরের পারে/পবিত্র সে এক গাছে/ফুল ফুটেছে সাড়ে তিন শো/ফল যে মোটে বারো/শক্ত গুলোয় হাত দিয়ো না।/নরম দেখে পাড়ো।

ক্রিসমাস, ইস্টার ও অন্যান্য বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে খুশির নেশায় সবার মন যখন উড়ু উড়ু, তখনই বসে 'খেল' গীতিনাট্যের আসর। নাটকের কলাকুশলীরা বাদ্য সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে। 'রেগেদোর'-এর (গ্রাম্য প্রধান) বাড়ি থেকে গানের রীতি অনুযায়ী তাঁর সম্মতি ও আশীর্বচন নিয়ে গৃহ পরিক্রমা শুরু হয়। মেস্ত্রে-ই (দলপতি) একাধারে এই গীতিনাট্যের রচয়িতা, প্রযোজক, ও পরিচালক ও সূত্রধার। হাস্যোদ্রেককারী বিচিত্র ও উদ্ভট পোশাক পরে গ্রাম পরিক্রমাকালে এঁরা পূর্বনির্ধারিত পৃষ্ঠপোষকদের বাড়ির উঠানের সামনে নাটক মঞ্চস্থ করেন। ঢোল, ক্লারিনেট, বেহালা ও ট্রাম্পেট বাজিয়ে কুশীলবের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়। মন্ত্রমুগ্ধের মত গ্রামবাসীরা নৃত্যগীত উপভোগ করেন। গানের তালে তালে খেল-এর সংলাপ খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কুনবী গান মুখ্যতঃ কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত। গাইয়েরা গাইতে গাইতে বাজনার তালে তালে হাততালি দেন। মেয়েদের কুনবী গানের ছন্দোবদ্ধ বা পদ আকারে ছোট হলেও তা যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল। ঢোল বাজার তালে তালে পা পড়ে, শুরু হয় মেয়েদের ফুগদ্‌দি নাচ, মুখে মুখে গান; নষ্ট মেয়ে ইভালিন্ এবং সংগী-সাথী/কিনলে একটা শুয়োর/সূর্য ওঠার তখন অনেক বাকি/বাঘে খেলে শুয়োর।/ কানে সোনার দুল দুলিয়ে/ওই দেখ যায় নষ্ট মেয়ে।/ কি মজা গো, কালকে রাতে/ময়দা মাখ্‌ছি গুড়ের সাথে।/ তিনটে পেঁড়া এক নজরে/ঠাকমা বেচে: মিষ্টি খেতে।/ লাল পেড়ে সাদা শাড়ি/নাচতে লাগে মজা ভারি।

বাচ্চাদের পিঠে চাপড় মেরে ঘুম পাড়ানোর রীতি অতি প্রাচীন। দেশ ও কালভেদে এই রীতি চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়ানোর সময় সুর করে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে থাকেন। গোয়ার ঘুম পাড়ানিয়া গানের পদ ও লয় বিলম্বিত। উভয়ই হস্তপদ সঞ্চালনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঘুম আয়, ঘুম আয়, আয় ঘুম আয়রে।/খোকন সোনা খেলতে গিয়ে/দূরে গেল ঘুরতে।/আসবে তো সেই সাড়ে চারটায়/কতনা কাজ করতে। দোদুল দোলে সোনারে/দুলে হল রোদারে/তোলে ফুলের খোকারে। ও কাক, তুই ছোঁ মেরে ফুল/বসলি কেন গাছে রে?/খোকন সোনার মিছামিছি/ক'দাতে কি আছে রে? শিশু বড় হয়ে যখন বুঝতে শেখে তখন সে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে চায়। ঠাকুরমার ঝুলি থেকে সে সব গল্প বেরিয়ে আসে, সেগুলো প্রায়ই সুরাশ্রয়ী হয়। গল্প বড় হলে কিছুটা সাধারণভাবে বলে বাকিটা সুরে বলা হয়। গানের সুরবৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। ওলো বুড়ির নাতি গো/(আয়) মরদপারা হ'াটি গো/ পাহাড় ঘেঁষে বেড়াচ্ছে দেখ/বরের সাথে বৌ।/তেমনভাবে হ'াট না দেখি/সংগিনী নেই কেউ?

নাচুনি মেয়ে (কোলবত)দের পেশাগত নাচ দেখনি কোংকনী লোকসীতির অপরিহার্য অংগ। বিবাহ উপলক্ষে হিন্দু কোংকনীর গৃহে অতিথি অভ্যাগতের মনোরঞ্জনের উদ্দেশে দেখনি নৃত্য ও তৎসহ গীত পরিবেশিত হয়। কোলবতের সমস্ত অংগ নানা মূল্যবান আভরণে ঝলমল করে—পায়ে ঘুঙুর, নাকে নাকছাবি, হাতে চুড়ি, গলায় দামী হার। কেশদামে শোভিত যূথিকাবেলির গন্ধে শ্রোতার মন হয়ে আবেগে রসঘন। নাচ ও গান দর্শকেরা উপভোগ করেন কানায় কানায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে তবলা ও সানাই। দেখনির একটি গানের বক্তব্য নাচনী নদীর ধারে গেছে, নৌকার মাঝি বা মেঝেনীকে অপর পারে নিয়ে যাবার জন্য নেচে গেয়ে অনুনয় বিনয় করছে। মাঝি বা মেকেনী প্রত্যুত্তর দিচ্ছে তার কথার। এইভাবে উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে নাচগান এগিয়ে চলে। কি শোভা তোর নাকছাবিটির, ও নাচুনী/ঝমঝমাঝম মল বাজে তোর পায়ে। শুনি।/ আমার নাকের গয়না দেব, পরবি নাকি?/আমার পায়ের মলও দেব তোমায়, সখি।/ তুমি যাবে যে পথ দিয়ে/এস বালা, দি' দেখিয়ে।/ আমার হাতের চুড়ি, ধনি, দেব তোমায়/হার পরিয়ে দেখব তোকে কেমন

মানায়।/ তুমি যাবে যে পথ দিয়ে।/এস বালা, দি দেখিয়ে। ঝমকমাঝম বাজে পায়ের মল/চুড়ির আওয়াজ কেমন মিঠা, বল ?/ দেখনি নাচের বাহার দেখ যত গুণিজন/পায়ের তালে উঠছে দুলে সারা শরীর মন।/ ঘরে ঘরে ফুটে আছে মল্লিকা আর বেলি/ও নাচুনী, আয়না কাছে, নেনা দুটি তুলি।/ ও সব ফুলে নেই প্রয়োজন, কড়িও নয় দাম/আমি নিজেই অনেক দামী, রূপের মোহন ধাম।

গোয়াবাসীদের সবচেয়ে প্রিয় গান হল মান্দো ও ধুরপদ। শুধু গোয়াতেই নয়, যেখানেই গোয়ার কোংকনী ভাষাভাষীদের দেখা গেছে, সেখানেই মান্দো ও ধুরপদ গানের মাধ্যমে কোংকনী লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার অনুসৃত হয়েছে। মান্দো মুখ্যতঃ প্রেমগীতি—এই গানে একদিকে আছে প্রেমিকপ্রেমিকার মিলনাত্মক পরিণতির সুখ ও আনন্দের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমন প্রকাশ পায় নিষ্ফল প্রেমজাত হতাশার বিধুর আকুতি। গানের পদ তিনটি চতুষ্কে বিন্যস্ত, শেষে থাকে দুই লাইনের ধুয়া। পদগুলি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিলম্বিত লয়যুক্ত এই গানের সুর মুখ্যতঃ আবেগ প্রধান। মান্দো জোড়ের গান—গায়কদের একজন ছেলে, অন্যজন মেয়ে হওয়া চাই। বেহালা, গীটার ও শুমোত্ত (ঢাক) গানের তালে তালে শ্রোতার মনে এনে দেয় এক অনির্বচনীয় অনুভূতি (বেহালা গীটার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার স্পষ্টতঃই মান্দো ও ধুরপদ গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপকরণের উপস্থিতির কথা স্মরণ করায়; কার্যতঃ এই ধরনের গানে পাশ্চাত্য প্রভাব সব থেকে বেশি)। নামকরণ, পাকাদেখা, বিবাহ ইত্যাদি সমস্ত মুখ্য অনুষ্ঠানে মান্দো গানে উৎসবের অপরিহার্য অংগ। 'প্রেমই জীবন, প্রেম ছাড়া জীবন নিরর্থক'—এই হল মান্দো গানের মূল বক্তব্য। প্রেমিকা প্রেমিককে বলে, "তুমি ছাড়া জীবনের নেই কোন অর্থ।" প্রেমিক প্রত্যুত্তরে বলে "তুমি ছাড়া জীবনের নেই কোন অর্থ।" মান্দো গানে চারটি পর্ব। প্রথম পর্বে প্রেমের মাধুর্যলাভে অধীর ও আকুল হয়ে কন্যা বলে: বারো বছর বড় হলাম/এই বাড়িতে/তবু পেলে, মা, কেউ এল না/আমায় নিতে ? সবাই জানে গীটার আমি/বাজাই ভালো/স্বর্গ হতে তাই বুঝি কোনো/দেবতা এলো ? কুমার যখন আসবে নিতে/দিস না বাধা/পুড়লে কপাল থাকবে বসে/তোমার রাধা।

দ্বিতীয় পর্বে প্রেমিকের রূপসৌন্দর্যের নয়নাভিরাম বর্ণনা : হে দেবতা, রূপে হল উজল ভুবন/চন্দ্র যেন ঐ গো জ্বলে নয়নমোহন ।/ প্রিয়তম, ও রূপের তুলনা কোথায় ?/পায়ের তলে পড়ে আছি, ব'রব তোমায় । কাছে এসে এই তনু, হে হৃদয়েশ্বর/মুখখানি ছু'য়ে ছু'য়ে যাও মনোহর ।/ চোখ দুটি মরি মরি যেন বেলিফুল/জ্বলিছে মুকুতা যেন, কোথা এর তুল ? ও চোখের দ্যুতি পেয়ে আমি বিমোহিত/মনে জাগে একি সুখ আনন্দ-আহত ?

তৃতীয় পর্ব আত্মসমর্পণের : যত ঢেউ ধরে আছে অসীম সাগর/চাঁদের কিরণ যথা ব্যাপ্ত বিশ্বময়/আমার মাথায় আছে যত চুল তত/ভালবাসা দিতে চায় ব্যাকুল হৃদয় । কাছে এসে একবার মেল গো নয়ন/দৃষ্টির পরশে হোক ধন্য এ জীবন ।

চতুর্থ বা শেষ পর্বে প্রেমের সফল পরিণতি তথা বিবাহের কথা উল্লিখিত হয় । ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য প্রণয়ী যুগলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সাধ্য কারোরই নেই । আলোকে আলোময় স্নেহের আঙিনা/চারিদিকে বয়ে চলে পুলকের নদী/দাওগো হৃদয় ভ'রে আশিস্, বিধাতা/এ জীবনে দয়া হয়ে থেকো নিরবধি ।/ আজি এই যুঁই বেলি সুগন্ধ বিলায়/এমনি সুবাস যেন চিরদিন রয় ।

মান্‌দো ও ধুরপদ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । মান্‌দো শেষ হতেই ধুরপদ গাওয়া হয় । দুই লাইনের পদবিন্যাস ধুরপদ নীতি রচনার অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য । মানুষের সুখদুঃখের নানা অনুভূতি ছাড়াও গোয়ার রমণীয় নৈসর্গিক শোভার বর্ণনাও প্রকাশ পায় এই গানে । ব্যংগ, শ্লেষ এই গানের অপরিহার্য অংগ । এই গান দ্রুত লয়ে গাওয়া হয় । ধুরপদে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মুখ্যতঃ তমোত্ত ব্যবহার করা হয় । বেহালাও বাজান চলে । গান ও বাজনার তালে তালে হাততালি দিয়ে গানের আকর্ষণকে বর্ধিত করা হয় । মান্‌দো কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও পরিশীলিত ভাবনায় সমৃদ্ধ, ধুরপদ ঘরোয়া পরিবেশের অন্তরংগ পরিচয়ে বাহিত । ঘড়িঘড়া নেই, নেইক ঘড়া/জলকে যেতে কিসের তাড়া ?/ এখন কোথাও বয়না বাতাস/আলু থালু কেন অংগের বাস ?/ আয়নাও নেই, নেই চিরুনী/জানলায় দেখ কার ছবি, ধনি ?/ শ্বেত সৈনিক এ্যান পাহাড়ে একা/লাল শাড়ি পরলে দেবে টাকা ।/ কে পরালে গলায় তোমার, বালা/হীরে ঝলমল গজমোতির মালা ?/ কে পরালে কানে তোমার, বালা/মোহন ও দুল রূপে ভুবন আলা ?/ কে পরালে পায়ে তোমার বলো/

এমন সোনার চটি ঝলোমলো ?/ কে পরালে হাতে তোমার মেয়ে/বালা উজল হীরা চুনির চেয়ে ?/ শশক কাটায় সারাজীবন বনে/চুপটি করে, খেদ নেইক মনে ।/ আর কতদিন তেমনি এ জীবন/বাপের বাড়ি কাটাই অন্যমন ?/ মাগো, শোন, রাত্রি যখন আসে/সংগীবিহীন একলা মরি ত্রাসে ।/ জামাইবাবু, দিদিকে যাই নিয়ে/পিঠা খাবে বাপের বাড়ি গিয়ে ।/ তোমার দিদির জুতো জোড়া/মুচি গ্যাছে নিয়ে/দিদিকে কি পাঠান যায়/এমনি খালি পায়ে ?/ দিদির পোশাক ধরজি বাড়ি/তৈরি হয়নি তা'/বিনা পোষাকে কেমনে পাঠাই/খেতে তারে পিঠা ?/ তোমার দিদির গয়না যত/স্যাকরা গড়ে দেবে/বিনা গয়নায় কেমনে পাঠাই/তুমিই বল ভেবে ।/ ওরে মেয়ে, জল্‌দি ঘরে চল/বাগানে তুই কি করছিস বল ?/ এখানে, মা, নেইক কোন সাথী/ব'সে ব'সে সুতোয় মালা গাঁথি ।/ চুপটি ব'সে লাভ কি মেয়ে, ওলো,/প্রার্থনারই সময় যখন হোলো ?/ কোনো ছেলেই ভোলাতে পারবে নাগো/ফুলের লোভেই ব'সে আছি মাগো ।

ধুরপদের অবৃত্তি চলে এক মুখ হতে অন্য মুখে । কেউ মুখস্থ ধুরপদে জবাব দেয়, কেউ মন থেকে বানিয়ে বলে । ধুরপদের একক ও ঐকতানিক উভয় অনুষ্ঠানেই গণমানসে এক অনাস্বাদিত জোয়ার আনে । এক এক সময় ধুরপদের তাল এমন দ্রুত হয় যে গানের কথা শোনা বা বোঝা যায় না, শুধু একক বা বহু কণ্ঠের সম্মিলিত সুর ও অবোধ্য কথাটুকু শোনা যায় । সুরের সংগে বাদ্যযন্ত্রের লয়কারির রেশ অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও দেহে মনে অনুরণিত হয়ে চলে দিনের পর দিন ।

লেনিনের ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

লেনিন

ম্যাক্সিম গোর্কি

…তাঁর ছবি আঁকা কঠিন। তাঁর সমস্ত কথাই যেমন খাঁটি ও সোজাসুজি, তিনি নিজেও ছিলেন ঠিক তেমনই।

তাঁর বীরত্বে বাইরের কোন চাকচিক্য প্রায় ছিল না বললেই চলে, তাঁর বীরত্ব—এমন একজন মানুষের বীরত্ব যিনি জনসাধারণকে সুখী করার দুরূহ প্রয়াসে পরিহার করেছেন নিজের সমস্ত পার্থিব আনন্দ…

ঘটনাচক্রে যাঁরা বিপ্লবী হয়েছেন এমন কয়েকজন এলেন রাশিয়া থেকে। তাঁরা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাওয়া, ভীত সন্ত্রস্ত কতকগুলি লোক, যাঁরা নিজেদের সম্পর্কেই ঘৃণা ও দ্বেষ প্রকাশ করছেন, আর মনের ঝাল মেটাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে, যারা এই "নিষ্ফল উদ্যম" ওদের টেনে নামিয়েছে।*

"সবই নষ্ট হয়ে গেল", ওরা বলল। "সবই ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সবকিছু, সকলেই তো নির্বাসনে আর জেলে।"

হঠাৎ, যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে, আমি সেখানে হাজির হলাম রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কংগ্রেসে।**

আমি বুঝলাম, সংস্কারকামী আর বিপ্লবী এই দুই দলে পার্টি কত স্পষ্টভাবে ভাগ হয়ে গেছে।

ভ্লাদিমির ইলিচ তাড়াতাড়ি মঞ্চে উঠে গেলেন। তাঁর গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা "র" উচ্চারণের জন্যই মনে হচ্ছিল, ভাল বক্তা তিনি নন। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই অন্য সকলের মত আমিও একেবারে তন্ময় হয়ে গেলাম। অত্যন্ত জটিল সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে

---

* ১৯০৫-১৯০৭ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিপ্লবে বিজোয়ী প্রলেতারিয়েতের পরাজয় ঘটে। লেখক এখানে তাঁদের কথাই বলেছেন যাঁদের রাশিয়া ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

** ১৯০৭ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

যে এত সহজে বলা যায়, এ ক্ষমতা আর একজনের মধ্যেও আমি দেখি নি। বক্তা মোটেই চমৎকার কতকগুলি শব্দ-মালা চয়ন করেন নি, বরং প্রতিটি কথা নিজের দায়িত্বে বেছে বেছে বলেছেন, যেন সে কথাগুলির যথাযথ অর্থটি তিনি প্রকাশ করছেন এমন অনায়াসে যে আশ্চর্য হতে হয়। মনে যে অসাধারণ ছাপ তিনি ফেলেছিলেন তা বর্ণনা করা কঠিন।

তাঁর আগে যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁদের চেয়ে কমই তিনি বললেন, কিন্তু মনের উপর ছাপ ফেললেন অনেক বেশি। কেবল আমারই যে সেটা মনে হয়েছে তা নয়, আমার পিছন থেকে খুসীতে ভরা চাপা গলায় একজনকে বলতে শুনলাম :

"শুছিয়ে কি সুন্দর বললেন।"

নিজের অবসর সময়ে, এমনকি একটু সময় পেলেই তিনি যেতেন শ্রমিকদের মধ্যে, খোঁজখবর নিতেন তাদের জীবন সংগ্রামের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলি সম্পর্কে।

লেনিনকে আগে দেখেন নি এমন কিছু শ্রমিক হাইড পার্কে আলোচনা করছিলেন কংগ্রেসে লেনিনকে দেখে তাঁদের যা কিছু মনে হয়েছে সে সম্পর্কে। লক্ষণীয় যে, তাঁদের একজন মন্তব্য করলেন :

"আমি ঠিক জানিনা—ইওরোপে হয়ত শ্রমিকদের পক্ষে এর মতই কুশলী কেউ আছেন—বেবেল কিংবা তাঁর মত অন্য কেউ। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এঁকে প্রথম দেখেই আমার যত ভাল লেগেছে, তেমন অন্য কাউকে লাগত।"

অন্য একজন হেসে এর সঙ্গে যোগ করলেন :

"ইনি আমাদেরই একজন!"

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মে সরমোভো শ্রমিক দ্মিত্রি পাভলভকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর মতে লেনিনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি কি।

"সরলতা। তিনি সত্যের মতই সরল।"

তাঁর সমস্ত অনুভূতি ও উপলব্ধি এত স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে একক এক চিন্তাস্রোতে এসে মিলে যায় যে তা বর্ণনা করা কঠিন।

কম্পাসের কাঁটার মত তাঁর সমস্ত চিন্তাভাবনা সবসময়েই নির্দেশ করে থাকে মেহনতী মানুষের শ্রেণীস্বার্থের দিকে।

লণ্ডনে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে বিশ্রামের জন্য ক্যাপ্রিতে, তিনি যাবেন।

কিন্তু সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার আগেই তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হল প্যারিসে,* ছাত্রদের ছোট একটা দু'ঘরের ফ্ল্যাটে। সেটাকে কেবল আকারের দিক থেকেই ছাত্র থাকার ফ্ল্যাট বলা যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করার দিক থেকে নয়। ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে আমি গিয়েছিলাম এমন একটা নতুন প্রকাশনা-ভবন গড়ে তোলার ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য, যাতে করে আমাদের সমস্ত লেখক-সাহিত্যিককে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা যায়।

পশ্চিমের ও রুশ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে, সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে একাধিক বই লেখা দরকার বলে আমি মনে করলাম যাতে শ্রমিকরা নিজে নিজেই শিখতে পারেন এবং প্রচার পারেন এমন যথেষ্ট তথ্যমূলক মালমশলা তাঁরা পান।

ভ্লাদিমির ইলিচ অবশ্য সে পরিকল্পনা নাকচ করে দিলেন এই বলে যে সেসব ব্যবস্থা রয়েছে আর লোকজনকে সংগঠিত করাও কঠিন; তাঁদের বেশিরভাগই ব্যস্ত পার্টির ব্যবহারিক কাজকর্মে, লেখার সময় তাঁদের নেই। আমাদের যা দরকার তা হল একটা সংবাদপত্র আর প্রচার-পুস্তিকা।

লোকজনের কাছে অমোদের হাজার হাজার, লাখ লাখ ইস্তাহার দেওয়া দরকার। কিন্তু এত বেশি ইস্তাহার বে-আইনীভাবে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। সুসময় না আসা পর্যন্ত একটা প্রকাশনা ভবন গড়ার কাজটা আমাদের স্থগিত রাখতে হবে।

এরপর অনেকগুলি ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করে দেখালেন যে যুদ্ধ আসন্ন, এবং "সম্ভবত কেবল একটাই নয়, পর পর অনেকগুলি যুদ্ধ।" এই ভবিষ্যদ্বাণী অল্পদিনের মধ্যেই বলকান অঞ্চলে সমর্থিত হল।

"যুদ্ধ হবেই। তা অনিবার্য। পুঁজিবাদী দুনিয়াটাই পচে গেঁজিয়ে যাওয়ার মত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, মানুষ জাতিদম্ভ আর জাতীয়তাবাদের বিষ গিলতে শুরু করেছে।"

---

* ১৯১১ এবং ১৯১২ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি প্যারিসে ছিলেন এবং সেখানে লেনিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

তিনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। একবার ভাবুন দেখি!" বললেন তিনি খানিকটা বিস্ময়ের ভাব নিয়ে, বললেন জোর দিয়েই কিন্তু শান্তস্বরে। "যারা পেটপুরে খাচ্ছে-দাচ্ছে তারাই কেন যে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বুভুক্ষুদের পরস্পরকে জবাই করার জন্যে, সেটা ভাবুন? এর চেয়ে বেশি কাণ্ডজ্ঞানহীন, এর চেয়ে বেশি বিতৃষ্ণা জাগানোর মত কোনো অপরাধের কথা ভাবতে পারেন কি? এর জন্য শ্রমিকরা প্রচণ্ড মূল্য দেবে, কিন্তু শেষে তারা জয়ী হবে; সেটাই ইতিহাসের অভিলাষ।"

প্যারিসের পর আবার আমাদের দেখা হল ক্যাপ্রিতে।

লণ্ডন কংগ্রেসে দেখেছি, লেনিন ছিলেন অটল, অনমনীয়; আর এখানে যে ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখলাম তিনি আরো বেশি অটল; আরো অনমনীয়। কিন্তু ওখানে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন; এমন কতকগুলি মুহূর্ত এসেছিল যখন যে কেউই স্পষ্ট বুঝতেন যে পার্টির ভাঙ্গন তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে।

এখানে তিনি প্রশান্ত।

কিন্তু ক্যাপ্রিতে অন্য এক লেনিনও ছিলেন—চমৎকার এক কমরেড, হাসিখুশী একজন মানুষ, দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর রয়েছে অফুরন্ত প্রাণবন্ত আগ্রহ, আর মানুষের প্রতি একটা আশ্চর্য রকমের দরদী মনোভাব।

অন্য সবার চাইতে এত উঁচুতে উঠেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভ সংবরণ করতে পেরেছেন এবং "সাধারণ মানুষ" সম্পর্কে গভীর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন, এমন অন্য আর একজন মানুষের কথাও আমি চিন্তা করতে পারি না।

তাঁর আকর্ষণ করার ক্ষমতা এমনই ছিল যার বলে মেহনতী মানুষের মন আর সহানুভূতি তিনি জয় করতেন। ইতালিয়ান তিনি বলতে পারতেন না। চালিয়াপিন* এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট রুশীকে আগেই দেখবার অভিজ্ঞতা থাকায় ক্যাপ্রির ছেলেরা কিন্তু নিজেদের সহজাত বিচারবুদ্ধিতেই তাঁকে বসিয়েছিল এক বিশেষ আসনে। তাঁর হাসিতে ছিল অপূর্ব মাধুর্য।

"কেবল সৎ মানুষই এভাবে হাসতে পারেন", মন্তব্য করেছিলেন বৃদ্ধ ধীবর জিওভান্নি স্পাডারো।

---

* ফিওদোর চালিয়াপিন ছিলেন একজন বিখ্যাত রুশ গায়ক।

দুর্দশা, দুঃখ আর দুর্ভোগের প্রতি লেনিনের মত এত গভীর ও প্রচণ্ড ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ অন্য কারো ছিল বলে আমার জানা নেই, সেরকম কাউকে আমি কোনোদিন দেখি নি।

এই মনোভাব, জীবননাট্য আর জীবনের করুণ পরিণতির প্রতি এই ঘৃণাই ভ্লাদিমির লেনিন সম্পর্কে আমাকে অনেক বেশি ভাবিয়েছে।

লেনিনের অসাধারণ মহত্ব বলে আমি যা মনে করি তা হল দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে তাঁর এই আপসহীন, অনির্বাণ বিদ্বেষ, এবং তাঁর এই ঐকান্তিক বিশ্বাস যে দুঃখ-দুর্দশা প্রাণধারণের কোন অনপনেয় ভিত্তি নয় বরং তা একটা ঘৃণ্য ব্যাপার যা মানুষ ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারে এবং মানুষকে তা করতেই হবে।

তাঁর চরিত্রের এই মূল বৈশিষ্ট্যটিকে আমি বলব, একজন বস্তুবাদীর সংগ্রামী আশাবাদ। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমার মন আকর্ষিত হয় বিশেষ করে এই মানুষটির প্রতি—মানুষই, তবে তার 'ম'টি বড় হরফে লিখতে হয়।

জনসাধারণের সৎ নেতাদের করতে হয় এক অমানুষিক কঠিন কাজ। আর তারপর আবার লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবের যারা ছিল বিরোধী তারাও সংগঠিত হয়েছিল ব্যাপক আকারে, প্রবলভাবে।

লেনিনের নির্মমতা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা ও লেখা হয়েছে। মিথ্যা আর কুৎসার জবাবে তাঁকে সমর্থন করতে যাওয়ার মত হাস্যকর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমি স্বভাবতই দিতে যাব না। আমি জানি যে কুৎসা আর মিথ্যা হল পেটিবুর্জোয়ার কর্মনীতিতে ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি, সাধারণত এ কৌশল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার সময়ই তারা ব্যবহার করে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে এমন একজনও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না লোকে যাদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা না করেছে। সকলেই তা জানেন।

লেনিনের প্রতি বিশ্বের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিদ্বেষ অত্যন্ত স্থূল ও জঘন্যভাবে স্পষ্ট, আর তাদের শরীরে প্লেগের প্রকোপের নীল নীল দাগগুলি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠছে সর্বত্র। জঘন্য হলেও তাদের এই বিদ্বেষই আমাদের বুঝিয়ে দেয়, সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়ানদের প্রেরণা ও নেতা লেনিনের

ভাবমূর্তি বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখে কত বড় এবং ভীতিপ্রদ। সশরীরে তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর বিশ্বের সর্বত্র মেহনতী মানুষের কাছে ধ্বনিত হচ্ছে ক্রমেই আরো প্রবলভাবে, আরো জয়োল্লাসে, এবং এখন এমন কোনো প্রান্তই নেই যেখানে এই আওয়াজ তাদের উদ্বুদ্ধ করবে না বিপ্লব সম্পাদনে, নতুন জীবনের জন্য আর সবাই যেখানে সমান এখন এক দুনিয়া সৃষ্টির জন্য সংগ্রামে।*

(সোভিয়েত সমীক্ষা, সংখ্যা ৫৮-৫৯, ১৯৭৯ থেকে গৃহীত)

* মহান প্রলেতারিয়ান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি এটি লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে, ১৯৩০ সালে তিনি রচনাটি সমধিকভাবে পরিবর্তন ও সংশোধন করেন।

কমরেড স্তালিনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

এই বিষয়ে আপাতত কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল না। তবু সে কাজে হাত দিতে হল কয়েকটি কারণে। গত ২১শে ডিসেম্বর স্তালিনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, পণ্ডিত ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। বক্তৃতাগুলি শুনে নিজেকে প্রশ্ন করি, নতুন কি পেলাম? তথ্য হিসেবেই বা কি পেলাম, চিন্তার খোরাক হিসেবেই বা কি পেলাম! এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে প্রশ্নটা দানা বেঁধে উঠল—স্তালিন-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো কি উদ্দেশ্যে? গতানুগতিকভাবে রেওয়াজ রক্ষার জন্য? মামুলী কতকগুলি কথার পুনরাবৃত্তির জন্য? না তার চেয়েও বেশি কিছু চাহিদা ও করণীয় থাকতে পারে? সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন অনুজপ্রতিম বন্ধু বললেন—আজকের দিনে স্তালিনের প্রাসঙ্গিকতা কি তাই নিয়েই আলোচনা হওয়া দরকার। কথাটাকে উড়িয়ে দিতে পারি নি, বরং যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বলতে বন্ধুটি কি বোঝাতে চান জানিনা। তবে আমি যা বুঝেছি সেটুকু লিখছি।

আমরা যারা আলোচনা করছি তারা কারা? সেই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ হলেও নিজেদেরই মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা হলাম নতুন ইতিহাস রচনার সংগ্রামের সৈনিক। সুতরাং আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য নিছক 'অ্যাকাডেমিক' গবেষণা নয়, বুদ্ধির কসরৎ দেখানোও নয়, নিছক রেওয়াজ রক্ষার খাতিরে জন্মদিবস পালনও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য আলোচনার মাধ্যমে নতুন কিছু দেখা, চিন্তার কিছু নতুন খোরাক সংগ্রহ করা। নতুন কিছু শিখতে চাই বা নতুন ধরনে ভাবতে চাই কেন? আমাদের সামনে ইতিহাস যে জটিল, কঠিন কর্তব্য উপস্থিত করেছে তার মোকাবিলায় নতুন পাথেয় সংগ্রহ করা, লড়াইয়ের নতুন কায়দা শেখা, পরীক্ষিত কায়দা-

গুলিকে আবার খালিয়ে নেওয়া। আমার মতে এটাই হওয়া উচিত আলোচনার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

তাই যদি মেনে নিই তাহলে স্তালিনের প্রাসঙ্গিকতা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন বিশ্ব ইতিহাসের বিগত কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত। সে ইতিহাস সাম্প্রতিক। আজও নানাভাবে তার জের আমাদের টেনে চলতে হচ্ছে ও হবে: ভাল ও মন্দ দুই দিকেরই। আজ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে জাতির জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে সেই সাম্প্রতিক অতীতের একটা হিসেব-নিকেশ করে যতটা সম্ভব অভিন্ন ধারণায় পৌঁছাবার চেষ্টা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। অতীতে এগিয়ে চলার পথে কোন কোন জিনিস সাহায্য করেছে আর কোন কোন দিক বাধা সৃষ্টি করেছে যার জন্য যতটা এগোন সম্ভব হত অথচ সম্ভব হয় নি—এই সবের হিসেব-নিকেশ। আরও একটি দিক আছে এই কাজের। অতীতের কোন কোন উপাদান এখনও অগ্রগতির পথে সাহায্য করবে এবং কোন ভুলের শিকড়গুলি এখনও আমাদের চিন্তায়, কাজে বজায় রয়েছে তাও খুঁজে বার করতে হবে। এই দুই ধরনের হিসেব-নিকেশের সময় ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। তখন কি কি ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে আর আজকের দিনে যে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে—দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায় এবং পার্থক্যই বা কোথায়? আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ: স্তালিনযুগে এবং স্তালিনের কাছে আমরা যা শিখেছি সেই সব শিক্ষার কোন কোন অংশ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্ত মাটির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এবং এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছে আর অন্যপক্ষে কোন কোন জিনিসের দরুন এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে বা সাফল্যের যতটা সম্ভাবনা ছিল তার ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারি নি! এইগুলিই হওয়া উচিত মুখ্য বিচার্য বিষয়। সুতরাং অতীতের বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন দুয়েরই ক্ষেত্রে হিসেব-নিকেশের পালায় স্তালিনপ্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সেইজন্যই স্তালিন নিয়ে এত বিতর্ক। সেইজন্যই অনিবার্য হয়ে ওঠে স্তালিনের মূল্যায়নের প্রশ্ন।

আমরা কমিউনিস্টরা নিজেদের দেশের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবেই বিশ্ব-

ইতিহাসের পটভূমিতে বিচার করি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যেসব কারণে বিভিন্ন ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ স্তালিনের মূল্যায়নে তীব্র মতান্তর। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদেরও সেটা অন্যতম কারণ। এখানে মানুষ হিসাবে স্তালিন কেমন ছিলেন, কতটা ভাল আর কতটা মন্দ, কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর, তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় মার্কস-লেনিনের শিক্ষাকে চাঁছাছোলাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা অথবা সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের কতখানি অভাব ছিল—সেসব বিষয় নিয়ে আরামকেদারানশীন পণ্ডিত ব্যক্তিরা গবেষণা করতে থাকুন। অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়ার ধরনে স্তালিনকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের মুক্তির বৈপ্লবিক সংগ্রামের সৈনিকদের কাছে ঐসব বিষয় অবান্তর না হলেও গৌণ।

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে স্তালিনের মূল্যায়নে কোন অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টদের পক্ষে সেরূপ সম্ভাবনাকে সুদূরের জিনিস বলে আমি মনে করি না। বর্তমানে ইতিহাসের অমোঘ তাগিদে দুই কমিউনিস্ট পার্টি পরস্পরের অনেক কাছে এসেছে, তত্ত্ব ও কর্ম দুই দিক থেকেই। ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে। আমরা যারা ঘটনার এই পরিণতিকে স্বাগত জানাই এবং উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তারা মনে করি স্তালিন সম্পর্কে চিন্তা-বিনিময়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্তালিনের মূল্যায়নের কাজে আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন হওয়া উচিত ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্তালিনের শিক্ষার মূল্যায়ন। তাঁর শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে যেয়ে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি এবং কোন কোন বিষয়ে ভুলত্রুটি করেছি তার বিশ্লেষণ খুবই জরুরী। এ বিষয়ে পুরোপুরি মতের ঐক্য না হলেও যতদূর সম্ভব অভিন্ন একটা ধারণায় পৌঁছানো যেতে পারে বলেই মনে করি। এদেশের পরিস্থিতিতে স্তালিনের শিক্ষা প্রয়োগে যেসব ভুলত্রুটি হয়েছে সেগুলি আলোচনার সময় কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। (১) কোন ভুলটা এদেশের তখনকার পরিস্থিতির ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফসল (২) কোন ভুলটা প্রয়োগের কৌশলে মার্কস-লেনিনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুতির ফল (৩) আর কোন ভুলটা আমাদের নাবালকত্বের দরুন অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণের জন্য ঘটেছে।

মোদ্দা কথা, স্তালিন নিয়ে আলোচনার লক্ষ্য হবে আমাদের আগামী দিনের লড়াইতে তত্ত্বগত হাতিয়ারগুলিতে শান দেওয়া এবং হাতিয়ার ব্যবহারের নতুন নতুন কায়দা আয়ত্ত করা।

স্তালিন মূল্যায়নের লক্ষ্য স্থির করার পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় পদ্ধতিগত প্রশ্নকে। এ যাবৎ দেখা গিয়েছে যে সংযত, ইতিহাস-সম্মত মূল্যায়নের বদলে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত পছন্দ-অপছন্দই অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রথম যুগে একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছিল। স্তালিনের ভুলত্রুটির সমালোচনার নামে তাঁর অবদানগুলিকেও নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। আজও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন কোন মহলে সেই ঝোঁকেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এদেশেও তার অস্তিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। অতি সম্প্রতি একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে জনৈক খ্যাতনামা মার্কসবাদী পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত পড়ে মনে হয় তিনি স্তালিনকে বাতিল করে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে কলম ধরেছেন।

স্তালিনের অবদান বলে যেসব জিনিস পরিচিত সেগুলি বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার এবং তাদের লড়াইতে শাণিত হাতিয়ার। সেগুলিকে নস্যাৎ করার অর্থ হাতিয়ারগুলিকে বর্জন অথবা ভোঁতা করে দেওয়া। যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি বৈপ্লবিক সংগ্রামের থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে মতামত প্রকাশ করেন তাঁদের পক্ষে হাতিয়ারগুলিকে ভোঁতা করে দেওয়াটা বুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কসরৎ হতে পারে। তাই বলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিযুক্ত বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে নিরস্ত্র হতে দেবে না। সেজন্য যে তরফ থেকেই চেষ্টা হোক, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

উপরোক্ত ঝোঁকটির বিপরীতে অপর একটি ঝোঁক প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই ঝোঁকের প্রবক্তারা ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সোভিয়েতের পার্টির ঐতিহাসিক প্রয়াসকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলে যুক্তিবিচারের বদলে গুরুবাদ এবং পুতুল পূজার মনোভাব শক্তিসঞ্চয় করে। আর তার পরিণতি হয় (১) অন্ধ অনুকরণের বদ্ধমূল প্রবৃত্তি (২) বিশ্বপরিস্থিতিতে যেসব যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকে অস্বীকার করা (৩) সবার উপরে নিজেদের নাবালকত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখা। যাঁরা আমাদের দেশে ঐ ঝোঁকটিকে প্রথমে শক্তিশালী

ছিলেন তাঁদের প্রধান অংশটি বর্তমানে সেই অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। কিন্তু তাঁরা যে বীজ বপন করেছিলেন ও যে বীজকে বেশ কিছুদিন সযত্নে লালন পালন করেছিলেন তার ফসল নকশালপন্থীদের মাও সে-তুং পূজায় উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অথচ এখন খাস চীনেই মাওয়ের ব্যক্তিপূজার ফসলগুলিকে মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে।

স্তালিনের অবদান বলে যেসব জিনিস পরিচিত সে প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ও পদ্ধতিগত প্রশ্নগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সাধারণত স্তালিনকে নিয়ে যেসব আলোচনা হয়ে থাকে, বক্তৃতার মাধ্যমেই হোক অথবা প্রবন্ধেই হোক, তা' সীমিত থাকে প্রধানত ব্যক্তি হিসাবে স্তালিনকে কেন্দ্র করে। যাঁরা স্তালিনকে বাতিল করে দিতে ইচ্ছুক তাঁদের তরফ থেকে বলা হত এবং এখনও হয় যে অবদানগুলির কৃতিত্ব সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আর ভুল ত্রুটিগুলি স্তালিনের। অন্যপক্ষে যাঁদের কাছে স্তালিন প্রশস্তিই মুখ্য তাঁরা এমনভাবে সমস্ত বিষয়টিকে উপস্থিত করেন যেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাটা ছিল নিষ্ক্রিয় অথবা গৌণ আর কৃতিত্বের সবটুকুই স্তালিনের প্রাপ্য। এই ধরনের ব্যাখ্যা তথ্যের ধোপেও টেকে না, মার্কস-লেনিনবাদী বিচার পদ্ধতির নিরিখেও টেকে না।

স্তালিন একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নন। তিনি বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা। তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য শুধু তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি নজর দেওয়াই যথেষ্ট নয়, একটি সমষ্টির নেতারূপে তাঁর কার্যকলাপকে বিচার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ একক স্তালিন নন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বকে মিলিয়েই বিচার করতে হবে। পার্টি গড়ে ওঠে, শক্তিসঞ্চয় করে, জনগণের নেতারূপে স্বীকৃত হয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায়। পার্টি নেতা তৈরী করে নিজের সামগ্রিক কার্যকলাপ এবং অভিজ্ঞতার ছাঁচে। তেমনি নেতৃত্ব এবং প্রধান নেতার দক্ষতা বা দক্ষতার অভাবের উপর পার্টির সাফল্য-অসাফল্যের পরিমান অনেকখানি নির্ভর করে। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কোন একটি দিককে অবহেলা করলে গুরুতর ভুল হতে বাধ্য। অবদানগুলির দরুন কৃতিত্বের সবটুকু নিশ্চয়ই একলা স্তালিনের নয়। সেগুলির মূলে রয়েছে লেনিনের শিক্ষা, সোভিয়েত

কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা এবং পার্টি নেতৃত্বের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ও কাজ। তেমনি ভুলে যাওয়া চলে না যে পার্টির বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা তথা সিদ্ধান্তকে তত্ত্বগতভাবে ও কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার প্রধান ভূমিকা ছিল স্তালিনের। সুতরাং কৃতিত্বের যে অংশ স্তালিনের প্রাপ্য তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। কারুর খেয়ালখুশি পছন্দ-অপছন্দমাফিক সেই ভূমিকা অস্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় পার্টির কার্যকলাপকে নাকচ করে দেওয়া।

এবার স্তালিনের ভুলভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে উপরোক্ত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে দেখা যাক। যাঁরা স্তালিনের ইতিবাচক দিকগুলিকে বড় করে দেখেন তাঁদের পক্ষেও (অবশ্য যাঁরা অন্ধ প্রশস্তির বদলে বস্তুনিষ্ঠভাবে, ভারসাম্য বজায় রেখে বিচার করেন) স্তালিনের ভুলত্রুটিগুলির কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষত স্তালিনের জীবনের শেষদিকে যে অনেক মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং ব্যক্তিপূজার ক্ষতিকর প্রভাব উৎকট রূপ ধারণ করেছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু একটা সামগ্রিক, সঠিক, ভারসাম্য বজায় রাখা মূল্যায়নের জন্য এগুলিকে বিশদভাবে দেখা দরকার। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে দুটি ভাগ করা চলে (১) লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েত পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেস এবং দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিজয়লাভ পর্যন্ত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তি পর্যন্ত। কি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সময়টা হল বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জনের যুগ। সাফল্যের পাশাপাশি ভুলচুকও হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার পর ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে বা চেষ্টা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ১৮শ কংগ্রেসে প্রদত্ত স্তালিনের রিপোর্টে সাফল্য ও ত্রুটি, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের কথাই বলা হয়েছে। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং দুই কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সময়ে সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব থেকেছে পার্টির সর্বোচ্চ কমিটির উপর অর্থাৎ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির উপর এই সময়কালের ভুলগুলির জন্য কতটা স্তালিনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং কতটা পার্টির সমষ্টিগত-নেতৃত্ব তা

বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার আছে। প্রধান নেতা হিসাবে স্তালিনের দায়িত্ব যেমন আছে ঠিক তেমনি সমষ্টিগত নেতৃত্বেরও আছে। এই কথাটা মনে রাখার পর দেখতে হবে ঠিক কোন্ কোন্ ভুলের কতটুকুর জন্য দায়ী স্তালিনের ব্যক্তিগত চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলি। দুটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে সূত্রটিকে পরবর্তীকালে অত্যন্ত ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর বলে স্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে'—সেটিকে উপস্থিত করা হয় এই যুগেই। উক্ত ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী কি শুধু স্তালিন একলা অথবা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে তখনকার ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিহিত ছিল ভুলের বীজ? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্তালিনের একটি বক্তৃতা অর্থাৎ প্রাচ্যের মেহনতী মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার প্রসঙ্গটি আমাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। স্তালিন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করেছিলেন সেটা কি তাঁর ব্যক্তিগত মত অথবা ঔপনিবেশিক দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের তৎকালীন ধ্যান-ধারণার মধ্যে ঐ বিশ্লেষণের বীজ খুঁজতে হবে? যে লক্ষ্য ও যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে স্তালিনের মূল্যায়নের কথা আমি ভাবছি তার পক্ষে দুটি জিনিসের উপরই আলোকপাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গোটা সময়টা ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক, সঙ্কটময়। কিছুকাল আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত 'লিবারেশন', 'ব্যাটল অফ দি বাল্জ', 'গ্রেট ব্যাটল' ও 'ব্যাটল অফ বার্লিন' নামে কয়েকটি চলচ্চিত্র এদেশে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ঐগুলি প্রায় ডকুমেন্টারি ছবি, অন্ততঃ তথ্যের দিক থেকে। ছবিগুলিতে দেখা যায় যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ অবধি স্তালিন, সোভিয়েত পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এবং সেনাপতিমণ্ডলী একত্রে বসে যৌথভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। সুতরাং এই সময়ে যেসব ভুল হয়েছে সেগুলির জন্য কতটুকু প্রধান নেতা হিসাবে স্তালিন দায়ী আর কতটুকু সমগ্র নেতৃত্বের দায়িত্ব—সে সম্পর্কেও জবাব পাওয়া দরকার। (২) দ্বিতীয় যুগ মোটামুটি যুদ্ধে বিজয়লাভের পর থেকে স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত। সাধারণত ব্যক্তিপূজার প্রাধান্যের কাল বলতে এই সময়টিকে ধরা হয়ে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের অল্প

কিছুদিন পরে পার্টির তত্ত্বগত মুখপত্র "কমিউনিস্ট"এ 'দি কাল্ট অফ দি ইনডিভিজুয়াল' নামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন তত্ত্বগত ইংরাজী মাসিক পত্রিকা "নিউ এজ", জুলাই ১৯৫৬ সংখ্যায় প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "'৩০-এর দশকেই ব্যক্তিপূজা ঝাঁকিয়ে বসতে থাকে এবং স্তালিনের ব্যক্তিগত চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলি তখন ব্যাধিতে পরিণত হতে শুরু করে। ফলে অনেক গুরুতর ভুলভ্রান্তি হয়, তাঁর কাজের ইতিবাচক দিকগুলির সঙ্গে নেতিবাচক দিকের মিশ্রণ ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকটাই প্রাধান্য লাভ করে। 'শত্রুপরিবেষ্টিত দেশে, অবরুদ্ধ দুর্গের অনুরূপ অবস্থায় নতুন সমাজ গঠন ও তাকে শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রগত নেতৃত্বের কঠোরভাবে কেন্দ্রীভবন, সুদৃঢ় সংগঠন এবং কঠিন শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে দরকার ছিল ব্যাপক গণতন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রিকতার সঠিক সমন্বয়। স্তালিন ঐরূপ সমন্বয়ের বদলে তাকে লঙ্ঘন করতে থাকেন আর তারই ফলে ব্যক্তিপূজা প্রসারলাভ করে।

স্তালিনের জীবনের শেষদিকে ব্যক্তিপূজা অত্যন্ত উৎকট রূপ ধারণ করে, পার্টির সম্বন্ধে লেনিনবাদী নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়, বিসর্জন দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে। স্তালিন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের মতামত উপেক্ষা এবং বহু প্রশ্নে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমষ্টিগত নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতিকে বর্জন করা হয়।"

(মর্মানুবাদ)

বিংশতি কংগ্রেসে স্তালিন ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার দ্বারা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন, সন্দেহ নেই। স্তালিনের পূজা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুদ্ধোত্তর যুগের পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের পথে তা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের মত দেশে কমিউনিস্ট পার্টি'র সাবালকত্বলাভের অন্তরায় রূপে কাজ করছিল। যুক্তি বিচার, পরিস্থিতির তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের স্থান নিয়েছিল গুরুবাদ, পুতুলপূজা। সেই সবকিছু জঞ্জাল অপসারণে বিংশতি

কংগ্রেসের অবদান অস্বীকার করা চলে না। তবু কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বাকী থেকে গিয়েছে এবং আমার মতে সমালোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। স্তালিন ব্যক্তিপূজার সব ব্যবচ্ছেদের জন্য নয়, ভবিষ্যতের শিক্ষালাভের পক্ষেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা ও পাওয়া অপরিহার্য। যথা (১) ব্যক্তি পূজার সূচনা যদি '৩০ এর দশকে হয়ে থাকে তবে যথাসময়ে তাকে প্রতিরোধের কোন প্রচেষ্টা হয়েছিল কিনা (২) পরবর্তী যুগে ব্যক্তিপূজা যেমন উৎকটরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছিল তা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মত বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পার্টিতে সম্ভব হয়েছে কিভাবে? অর্থাৎ স্তালিনের সমালোচনার সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের আত্ম-সমালোচনা যুক্ত হলে তবেই ফলপ্রসূ ও শিক্ষনীয় হতে পারত। (৩) স্তালিন ব্যক্তিপূজা শুধু সোভিয়েত পার্টিতে সীমিত ছিল না, বিভিন্ন দেশের কমিউ-নিস্ট পার্টিতে জাঁকিয়ে বসেছিল। ফ্রান্স, ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টির মত যেসব পার্টির গণভিত্তির প্রধান অংশটাই ছিল সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, যেসব পার্টির কঠিন লড়াইয়ের আগুনে পুড়ে ঢালাই হয়েছে সে সব পার্টিতেও ব্যক্তিপূজার অমন প্রভাব কিভাবে পড়ে? (৪) সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্বের তরফ থেকে বিংশতি কংগ্রেসের আগে বা কংগ্রেসের অন্তত: প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা কি প্রয়োজন ও সঙ্গত ছিল না? স্তালিন ত' শুধু সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা। ব্যক্তিপূজা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপরেও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরবর্তী যুগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মত-বিনিময়ের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে বারোটি পার্টির সম্মেলন, পরে একাশি পার্টির সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পারস্পরিক আলো-চনার দ্বারা অভিজ্ঞতা ও চিন্তা বিনিময়, তার সূত্রপাত ১৯৫৬ সালে হওয়া উচিত ছিল।

ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সমালোচনার গোড়ার দিকে তার মধ্যে একপেশেমি খুব বেশি পরিমাণে ছিল। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনেকেই তা

মেনে নিতে পারেন নি। উপরন্তু উপরে লিখিত প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া যায় নি। সোভিয়েত পার্টি বর্তমানে একপেশেমি কাটিয়ে উঠে স্তালিনের একটি সংযত, বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু প্রথম যুগের সমালোচনার এক-পেশেমির দরুণ বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে দুই বিপরীত মেরুর প্রতিক্রিয়া মাথা তুলেছে।

এক মেরুতে আছে ব্যক্তিপূজা তথা পুতুলপূজাকে অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকার একগুয়েমি। তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হয়েছে মাও পূজায়। স্তালিনের ব্যক্তিত্বে কখনও অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয় নি। স্তালিন কোন দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কালাপাহাড়ী মনোভাব অবলম্বন করা দূরে থাকুক, প্রশ্রয় দেন নি। স্তালিন কখনও প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে সমস্ত দেশের জন্য অতিসরলীকৃত রণনীতি তথা রণকৌশলের বিধান দেন নি। মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষাকে কতকগুলি অতিসরলীকৃত মন্ত্রে পরিণত করার মনোভাবকেও উৎসাহ দেন নি। মাও পূজায় এ-সবই করা হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলন যুক্তিবাদের, বিজ্ঞানসম্মত মতবাদের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিস্থিতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সমাজ-বিপ্লব-বিজ্ঞানের শিক্ষার আলোকে তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে। অথচ সেখানে উপরোক্ত শিশুসুলভ ব্যাধিগুলির প্রাদুর্ভাব হতে পারে কি কি কারণে? কমিউনিস্ট আন্দোলনে রোম্যান্টিক আবেগের স্থান একেবারেই নেই একথা আমি অন্ততঃ বলি না। রোম্যান্টিক আবেগের উপাদানটি না থাকলে নিছক যুক্তিবাদের সাহায্যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিঘ্নবিপদে ভরা দুর্গম পথে পাড়ি দেওয়া খুব সামান্য কয়েক জনের পক্ষে সম্ভব হয়। তাই বলে ব্যক্তিপূজা তথা পুতুলপূজার মনোভাব এমন ধরনের রোম্যান্টিক হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করবে যে যুক্তিবাদ, বিপ্লববিজ্ঞানের মূল শিক্ষা সবকিছু জোয়ারের ফলে ভেসে যাবে এরকম পরিণতি আশা করি নি। যদি তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হয় তবে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

অপর মেরুতে দেখা দিয়েছে যে প্রতিক্রিয়া এবং যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাও কম ক্ষতিকর নয়। এই মেরুতে যারা এখন অবস্থান

করছেন তাঁরা শুধু স্তালিন ব্যক্তিপূজাকেই নয়, স্তালিনকেই বর্জনের পক্ষপাতী। তাঁরা এতেই ক্ষান্ত নন, লেনিনকে নিয়েও টান দিচ্ছেন।

লেনিনের শিক্ষাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে হবে এমন কথা বলি না। আক্ষরিক অর্থে, পরিস্থিতি বিবেচনা না করে অনুসরণ করতে হবে এমন কথা লেনিন, নিজেও বলেন নি। বরং তিনি বারবার ঐ ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তেমনি একথাও কোনমতে অস্বীকার করা চলে না যে লেনিনের শিক্ষার মূলবস্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্য। সেই সত্যকে ধরে টান দেওয়ার অর্থ কার্যত কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরীক্ষিত হাতিয়ারগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করা, আন্দোলনের একেবারে ভিত্তিমূলে ফাটল ধরাবার প্রয়াস। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপরে উল্লিখিত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় (Mainstream) প্রকাশিত খ্যাতনামা মার্কসবাদী পণ্ডিতের লিখিত প্রবন্ধে। তিনি স্তালিন সমালোচনার অছিলায় অনেকগুলি এমন মৌল বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলি নিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চালিয়ে যেতে হচ্ছে, শত্রু না হয়েও যেসব মানুষ কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নানা সন্দেহ পোষণ করেন তাঁদের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা অনবরত করতে হচ্ছে। এই সব বিষয়ে কোন প্রশ্ন কেউ তুলবেন না এমন কথা বলি না। তবে তুলতে হবে সুষ্ঠু ভাবে; সঠিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা উচিত নতুবা সুস্থ বিতর্ক পরিচালনা সম্ভব নয়। কেউ যদি অন্য প্রসঙ্গের উপসংহারে হালকা চালে প্রশ্নগুলি তুলে ক্ষান্ত হন এবং ঐ ধরনের আলোচনা বিলম্বভাবে করার পক্ষে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলি পূরণ না করেন তবে তাঁর কাজ বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই সহায়ক হয়।

উক্ত প্রবন্ধটিতে কি কি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি কিভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের, মূল উপাদান বা ভিত্তি সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে, সে সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। কেননা সেক্ষেত্রে বিষয়গুলির উপরও অবিচার করা হবে, পাঠকদের উপরও জুলুম করা হবে। তবু দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটির কথা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

স্তালিন কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভীষণ ক্ষতি করেছেন বোঝাবার চেষ্টায় উক্ত লেখক জিজ্ঞাসা করেছেন (১) লেনিন যে কঠোর পার্টি সংগঠন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা সবক্ষেত্রে মেনে চলার কি প্রয়োজন আছে? (২) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা কি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য? গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় গণতন্ত্র কতটুকু আছে? (৩) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদের পর এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করার পরও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করা যাবে না কেন? একদলীয় শাসনব্যবস্থা কি সমস্ত ক্ষেত্রেই অপরিহার্য? উক্ত প্রবন্ধের লেখকের মতে স্তালিন ঐসব প্রশ্নকে সরাসরি নাকচ করে দেওয়ায় কমিউনিজমের আদর্শের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে।

মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। আমি অধ্যয়ন করেছি যাকে বলে যুদ্ধের মোর্চায় দাঁড়িয়ে। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের রচনা পড়েছি ব্রিটিশ আমলের কারাগারে দণ্ডিত বন্দীজীবনের কঠোর পরিবেশে। বাইরে এসে পড়েছি শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে। খানিকটা সুষ্ঠুভাবে পড়ার অবকাশ হয়েছে স্বাধীন ভারতে দুবার দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে। অধীত জ্ঞানকে সংগ্রামী অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচার করে দেখতে প্রয়াস পেয়েছি। অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা স্বভাবতই সম্ভব হয় নি। সবগুলি বই পাশাপাশি সাজিয়ে খুটিয়ে মিলিয়ে পড়ার সুযোগ কখনও পাই নি। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন থেকেই, যা বুঝেছি সংক্ষেপে লিখছি।

(১) বে-আইনী অবস্থায় বলশেভিক পার্টির জন্য যেসব সাংগঠনিক নীতি লেনিন নির্দেশ করেছিলেন সেগুলিকে সমস্ত ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি বিচার না করে হুবহু মেনে চলতে হবে এমন কথা স্তালিন কখনও বলেন নি। 'প্রবলেমস অফ লেনিনিজম' নামক বইটিতে 'অন দি পার্টি' শীর্ষক উপ-অধ্যায়ে তিনি পার্টি সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষার মূলবস্তু বা প্রাণসত্তাগুলিকে বলিষ্ঠ এবং বলা যেতে পারে সৈনিকোচিত precision বা তীক্ষ্ণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কমিউনিস্ট পার্টি হল বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী। তার মুখ্য ভূমিকা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত কঠিন জটিল, বহুমুখী, মরণপণ

সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া। সুতরাং এহেন জঙ্গী অগ্রবাহিনীর পক্ষে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং চিন্তা ও কর্মের ঐক্য অপরিহার্য। স্তালিন খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে এহেন পার্টির শৃঙ্খলা অন্ধ শৃঙ্খলা হতে পারে না। সেজন্য চাই শ্রেণীসচেতন, স্বেচ্ছামূলক শৃঙ্খলা। স্বেচ্ছামূলক অর্থ এই নয় যে কোন সভ্য যতটুকু খুশি মেনে চলবেন আর যতটুকু অপছন্দ তা মানবেন না। বৈপ্লবিক সংগ্রামে শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা বুঝেই তাঁরা পার্টিতে যোগদান করেন। স্তালিন বলেছেন যে সচেতন শৃঙ্খলার পূর্বশর্ত পার্টির ভিতরে সমালোচনা এবং মতদ্বন্দ্ব। তবে ব্যাপক আলোচনা ও মতসংঘাতের পর যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা মানতে সবাই বাধ্য।

(২) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অগ্রতম অবশ্য কর্তব্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত আলোচনা সংগঠিত করা, পার্টি কর্মীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও চিন্তা বিনিময়ের ব্যবস্থা। তারপর এইরূপ অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা তথা সাধারণীকরণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এমনিভাবে গড়ে ওঠে চিন্তা এবং কর্মের ঐক্য।

শৃঙ্খলা যাতে সচেতন হয় সেই উদ্দেশ্যে পার্টি কর্মীদের চেতনার মান উন্নয়নের চেষ্টা কতদূর হয়েছে না হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সমালোচনা-আত্মসমালোচনা চলতে পারে। কিন্তু শৃঙ্খলার নীতিকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ পার্টিকে একটি 'ডিবেটিং সোসাইটিতে' পরিণত করা।

পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের নীতি কি পরিমাণে পালিত হয়েছে অথবা লঙ্ঘন করা হয়েছে তা নিয়েও অবশ্যই সমালোচনা-আত্মসমালোচনা চলতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ পার্টিকে কতকগুলি ক্লাবের একটি ঢিলেঢালা 'ফেডারেশনে' পরিণত করা।

পার্টি সংগঠনের লেনিনবাদী মূলনীতিগুলির প্রত্যেকটির দুটি দিক বা অঙ্গ আছে। একটির সঙ্গে অপরটি অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। কোন একটি দিককে উপেক্ষা বা লঙ্ঘনের পরিণতি হয় কেন্দ্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, আমলাতান্ত্রিকতা ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলা নতুবা সংগঠনে, চিন্তায়, কর্মে—নৈরাজ্যবাদ। স্তালিন নিজে সচেতন শৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে কিভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পার্টিগুলিতে কোথায়, কিভাবে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র লঙ্ঘিত হয়েছে তা থেকে শিক্ষারও গুরুত্ব আছে। তবে, আমার মতে আলোচনাটা একতরফা হলে সঠিক শিক্ষা নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ পার্টিতে কোথায় কিভাবে গণতন্ত্রের নামে নৈরাজ্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি তার জঙ্গী চরিত্র হারিয়ে লেজুড়ে পরিণত হয়েছে, সে দিকটাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। মোট কথা উপরোক্ত দুটি বিচ্যুতির কোনটিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

(৩) শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দুটি দিক আছে একটি ধ্বংসাত্মক অন্যটি সৃজনাত্মক, একটি দমনমূলক অন্যটি শিক্ষামূলক। স্তালিন নিজেও সেকথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল নতুন ধরনের গণতন্ত্র—শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ নতুন অর্থে সম্প্রসারণ এবং ক্ষমতাচ্যুত শ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন ধরনে দমনমূলক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমজীবী মানুষের জন্য গণতন্ত্র নতুন ধরনে কতটা সম্প্রসারিত হয়েছে অথবা সঙ্কুচিত হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা বিচার করতে হবে ভিন্ন দৃষ্টিতে, সম্পূর্ণ ভিন্ন মাপকাঠিতে—কোন আদর্শ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মডেলে অবশ্যই নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার উপর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত শ্রমজীবী জনগণ কতটা সক্রিয় এবং সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং করার সুযোগ আরো কতখানি সম্প্রসারিত হতে পারে, এটাই হবে মাপকাঠি। একাধিক পার্টির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সেখানে মাপকাঠি হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেসব ঐতিহাসিক কারণে একটি মাত্র পার্টির অস্তিত্ব আছে তা কমিউনিস্টদের সুবিদিত। সেখানে কি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলনের নামে কৃত্রিমভাবে নতুন পার্টি গজিয়ে তুলতে হবে? যে সমাজে পরস্পরবিরোধীস্বার্থসম্পন্ন শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই সেখানে সরকারবিরোধীপার্টির ভূমিকা কি হবে? আসল কথা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যেকার মৌল চরিত্রগত পার্থক্য ভুলে যাওয়া চলে না।

লেনিনের জীবনকালের এবং স্তালিনেরও জীবনকালের পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে, সন্দেহ নেই। সেইসব পরিবর্তনকে যথাযোগ্য গুরুত্ব না দিলে খুবই ভুল হবে। কিন্তু লেনিনের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব পরিস্থিতির যা মূল দ্বন্দ্ব চলে আসছে তাতে

কি কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। একদিকে মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত আজও অব্যাহত রয়েছে। এ সংগ্রামে আপসের অবকাশ নেই। সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ পর্যায় কতদিন স্থায়ী হবে সে কথা এখন কেউ বলতে পারে না। শেষ পর্যায়ের লড়াই অনেক বেশি কঠিন, তীব্র, নির্মম হয়ে থাকে। আসন্ন ধ্বংসের ভয়ে সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র, মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং অত্যন্ত সুচতুরভাবে বহুমুখী লড়াইতে নেমেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণকে ক্ষমাহীনভাবে সমস্ত রণাঙ্গনে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এখানে যুদ্ধবিরতির কথাই ওঠে না। গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ সম্বন্ধে বিমূর্ত, ভাসাভাসা কথাবার্তার বদলে কঠোর বাস্তব সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলা ও সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক পরিপ্রেক্ষিত অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

উক্ত প্রবন্ধের লেখকের 'লেনিনবাদ' কথাটিতেও আপত্তি আছে। লেনিনবাদ সম্বন্ধে স্তালিনের সংজ্ঞায় অনেক ভুল আছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে স্তালিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী লেনিনবাদের অর্ধেকটাই এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়। তাঁর মতে লেনিন শুধু একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ প্রয়োগ করেছিলেন।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় এই প্রবন্ধে না যেয়ে শুধু একটি কথা বলতে চাই। লেনিন যে বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ প্রয়োগ করেছিলেন তাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে বুঝলে তবেই ঐ ধরনের মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়। লেনিন তাঁর সমসাময়িক বিশ্ব-পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেই বিশ্লেষণের তিনটি দিক আছে। সেগুলি যথাক্রমে, দীর্ঘমেয়াদী, তৎসাময়িক এবং ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা। লেনিন বিশ্ব-পরিস্থিতির পটভূমিতে যথাক্রমে (১) ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পরিস্থিতি (২) ঔপনিবেশিক দেশগুলির পরিস্থিতি (৩) রাশিয়ার পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রথমোক্ত তিনটি দিক বা অঙ্গ রয়েছে। সুতরাং যিনি বলেন যে লেনিন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসের শিক্ষাকে প্রয়োগ করেছেন তাঁকে ভাসাভাসা মন্তব্যের বদলে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতির কোন অঙ্গের কতটুকু সম্বন্ধে তাঁর কি বক্তব্য।

বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া লড়াইয়ের যে ত্রিমুখী প্রবাহের

সত্যটিকে লেনিন অত্যন্ত সুষ্ঠু তত্ত্বগত রূপদান করেছিলেন তার মূলবস্তুটি আজও অক্ষুণ্ণ আছে। লেনিনোত্তর যুগে সেই দুনিয়াজোড়া সংগ্রামের প্রধান সেনাপতিরূপে স্তালিনের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। তাঁর ভূমিকার ইতিবাচক দিকগুলিকে আমরা সযত্নে লালন করে এগিয়ে নিয়ে যাবো এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে নিষ্করুণভাবে বর্জন করবো।

স্তালিন ও ভারতবর্ষ

নরহরি কবিরাজ

সারা বিশ্বে আজ স্তালিন জন্মশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ চলছে। সবাই যে উৎসাহের সঙ্গে স্তালিন প্রশস্তিতে মেতে উঠেছেন তা মোটেই নয়। কেউ তাঁকে দেখছেন—দানব হিসাবে, কেউবা দেবতা হিসাবে। আবার কেউ কেউ স্তালিনকে এই দুটোর কোনোটাই মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন স্তালিন প্রশ্নটি এখনও আলোচনার বিষয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে—স্তালিন প্রসঙ্গ নিয়ে কেন এত বিতর্ক? স্মরণ করা যেতে পারে—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের গোপন রিপোর্টে স্তালিন প্রশ্নটি প্রথম আলোচনার বিষয়ীভূত করা হয়। স্তালিন চরিত্রের কুৎসিত দিকগুলি তুলে ধরে এই কংগ্রেস বিশেষ সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু এই আলোচনায় স্তালিন চরিত্রের নেতিবাচক দিকটির ওপর অত্যধিক বেশী জোর পড়েছিল এবং স্তালিন চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। বিংশতি কংগ্রেস যেরকম একপেশেভাবে স্তালিন প্রশ্নটির মূল্যায়ন করলেন তাতে প্রশ্নটির সমাধান হল না, বরং স্তালিন প্রশ্ন নিয়ে একটি বিশৃঙ্খলা বিতর্ক আরম্ভ হল। তদানীন্তন কালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সমেত বহু দেশের কমিউনিস্ট নেতারাই এই মূল্যায়নের ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তারপর থেকে স্তালিন প্রসঙ্গ নিয়ে বহু আলোচনা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্নভাবে করেছেন। এমন কি, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিও স্তালিন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা বন্ধ ক'রে দেন নি। বরং সম্প্রতি-কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন পুস্তকে, বিভিন্ন চলচ্চিত্রে স্তালিন প্রসঙ্গটি যেভাবে আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হয় সোভিয়েত পার্টিও স্তালিন চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলিকে উপেক্ষা করার পক্ষপাতী নন। এই প্রসঙ্গে "প্রাভদায়" (ডিসেম্বর ২১, ১৯৬৯) স্তালিন সম্পর্কে যে মূল্যায়ন প্রকাশ করা হয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাতে বলা হয়েছে—"প্রধান এক তাত্ত্বিক ও সংগঠক হিসাবে জে ভি স্তালিন পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ট্রটস্কীপন্থী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তাঁর তত্ত্বগত রচনাদি ও বাস্তব কাজকর্মের দ্বারা লেনিনবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রামে স্তালিন এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

"সেই সঙ্গে স্তালিন কতকগুলি তত্ত্বগত রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি করেন, যেগুলি তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে এক ক্ষতিকারক রূপ পরিগ্রহ করে।"

তাছাড়া, আমরা মনে করি স্তালিন প্রশ্নটির আলোচনায় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা যদিও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও শুধুমাত্র সোভিয়েত পার্টির মধ্যে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখলে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভবপর হবে না। অর্থাৎ আমাদের মতে প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেও স্তালিন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে হবে। কেননা, কমিন্টার্নের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসাবে, এমন কোনো কমিউনিস্ট পার্টি নেই যার কর্মকাণ্ডকে স্তালিন প্রভাবিত করেন নি। তাঁর তাত্ত্বিক রচনাবলী প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে তার কর্তব্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। আবার প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই তাঁর ভুল-ভ্রান্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কাজেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি স্তালিন প্রশ্ন নিয়ে একটি সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে উপনীত হোন—এ আমরা চাই। আবার এও আমরা চাই যে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্তালিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করুন। এই দু'য়ের যোগাযোগের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে, আমাদের দেশের মার্কসবাদীদের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। কেননা, স্তালিন ভারতের বিপ্লবের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এমন কি, ঔপনিবেশিক বিপ্লব সংক্রান্ত তাঁর রচনাবলীতে ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতির বারবার উল্লেখ এবং সে সম্পর্কে বিশেষ বিশ্লেষণ রয়েছে। ভারত সম্পর্কে স্তালিনের ঐ বক্তব্যগুলিকে আজ আবার যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন। দেখা দরকার—কালের আলোকে স্তালিনের এই বক্তব্যের কতটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং কতটাই বা হয় নি। ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিপ্লবের সমস্যা নিয়ে স্তালিন বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধ-

গুলিতে তিনি লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লব জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চরিত্রবিশিষ্ট। লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি আরও মনে করতেন—জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তখনই বৈপ্লবিক আকার ধারণ করবে, যখন এর ভিত্তি হবে শ্রমিক কৃষক মৈত্রী।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কিত লেনিনের উপদেশ সম্পর্কেও স্তালিন বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন—ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লব যেহেতু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চরিত্র-বিশিষ্ট তাই জাতীয় বুর্জোয়ারাও এই বিপ্লবে অন্যতম শক্তি হতে পারে। জাতীয় বুর্জোয়ারা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের দ্বারা নিপীড়িত তাই তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু তারা শোষক শ্রেণী, তাই তারা দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠলে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করতে উন্মুখ হয়। এইজন্যই তিনি জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈতচরিত্রবিশিষ্ট বলে মনে করতেন। লেনিনের উপদেশ গ্রহণ করে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়াদের শর্তাধীনভাবে সমর্থন দানের নীতি গ্রহণ করেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল থেকে তিনি চীনের বিপ্লব, ভারতের বিপ্লব, মিশরের বিপ্লব প্রভৃতির সমস্যাদি বিচার করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর সঙ্গে ট্রট্স্কীর প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয়। ট্রট্স্কী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিপ্লবের শক্তি বলে গণ্য করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ট্রট্স্কী মনে করতেন—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তিনটি শ্রেণীর মৈত্রী হতে পারে, এরা শ্রমিক, কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়া। অপরদিকে, স্তালিন মনে করতেন—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে চারটি শ্রেণীর মৈত্রী গড়ে উঠতে পারে—তারা হল শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া। জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈতচরিত্রের কথা মনে রেখেই তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের গুরুত্বের প্রতি স্তালিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

ঔপনিবেশিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে, স্তালিন ট্রটস্কীবাদী সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা-ধারার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেন।

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন, ভারতের জাতি-সমস্যা, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাবনা—প্রভৃতি নিয়েও স্তালিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এই বক্তব্যগুলির ইতিবাচক দিক এইখানে যে তিনি লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিসটি ভিত্তি করে ভারতের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের থিসিসে ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যবান উল্লেখ ও নির্দেশ রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনের ভারত বিষয়ক বক্তব্যের নেতিবাচক দিকগুলিকেও উপেক্ষা করলে ভুল হবে। তত্ত্বগতভাবে লেনিনের শিক্ষার প্রতি অনুগত থেকেও তিনি ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে, যথেষ্ট বিষয়গত বিশ্লেষণ না করে, কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ রয়েছে "ইউনিভার্সিটি অব দি টয়লার্স অব দি ইস্ট"-এ (১৮ মে, ১৯২৫) তিনি যে বক্তৃতা দেন তার মধ্যে। এই বক্তৃতায় তিনি এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে—একদিকে রয়েছে আপসমুখী বৃহৎ বুর্জোয়া, অপরদিকে রয়েছে বিপ্লবী পেটিবুর্জোয়া। এই সিদ্ধান্তের মূল কথা দাঁড়ায়—ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন জাতীয় বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে যোগ দিতে চলেছে। (ঐ বক্তৃতা—স্তালিন রচনাবলী, খণ্ড ৭)

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের চরিত্রবিশিষ্ট নয় এবং এই আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধীকে তিনি "সাম্রাজ্যবাদের সহচর" বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করলেন না। (স্তালিন—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট—স্তালিন রচনাবলী, খণ্ড ১২)। লক্ষ্য করার বিষয়, স্তালিনের এই বক্তব্যগুলি এমনি অবাস্তব সীমায় গিয়ে পৌঁচেছিল যে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস—জাতীয় বুর্জোয়া সম্পর্কে কতকগুলি সংকীর্ণতাবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও—স্তালিনের এই অবাস্তব বক্তব্যটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি।

বলাই বাহুল্য, কমিন্টার্নের সব থেকে শীর্ষ স্থানীয় নেতা স্তালিনের এই ভ্রান্ত মূল্যায়নগুলি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত

করেছিল। ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল। শুধু তাই নয়, স্তালিনের বক্তব্য অনুসরণ ক'রে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে থাকলেন। ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত Draft Platform of Action নামক দলিলে এই সংকীর্ণতাবাদী চিন্তা বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশেষ খেসারত দিতে হয়। কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে। এমনকি, ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, তার থেকেও কমিউনিস্টরা সরে দাঁড়ায়। এর ফলে অগণিত জনগণ, যারা এই আন্দোলনে যোগ দেয়, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রচুর ক্ষতি হয়।

ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে স্তালিন চরিত্রের মূল্যায়ন সোজা সরল রেখায় করা সম্ভব নয়। স্তালিনের রচনা, তাঁর নির্দেশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন ঔপনিবেশিক বিপ্লবকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি অবার তাঁর কোনো কোনো রচনা ও নির্দেশ এই বিপ্লবের রীতিমত ক্ষতিসাধন করেছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমরা স্তালিনের কর্মকাণ্ডের সঠিক মূল্যায়নের পক্ষপাতী। স্তালিন প্রশ্নটিকে ব্যবহার করে "ইওরো-কমিউনিজমের" পূজারী একদল কমিউনিস্ট যেভাবে সোভিয়েত বিরোধী অভিযানে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন—আমরা তার ঘোর বিরোধী। বিশেষ করে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাভিয়াগো কারিলোর বক্তব্যগুলি আমাদের মনে ভেসে উঠছে। স্তালিন প্রশ্নটিকে তাঁরা যেভাবে ব্যবহার করছেন তাতে মনে হয় স্তালিনের ভুল-ভ্রান্তি-অপরাধগুলি সোভিয়েত ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের মতে—স্তালিনের ভুল-ভ্রান্তি-বিকৃতি-গুলির সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থার কোনো যোগ নেই। সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করার ফলেই স্তালিন প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্তালিন প্রশ্নের পুনরুত্থান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যেসব নীতিনিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আমরা তাকে বিশেষভাবে স্বাগত

জানাই। আমাদের দেশেও ট্রটস্কো-কমিউনিজমের ভক্তেরা রয়েছেন। সম্প্রতিকালে "বারোমাস"-এ (শারদীয়া, ১৯৭১) প্রকাশিত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের প্রবন্ধটি এই মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রবন্ধটিতে তিনি ক্যারিলোর মত অনুসরণ করে "লেনিনবাদ" কথাটির যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন।*

একই কারণে যাঁরা স্তালিন পূজার অনুরাগী আমরা তাঁদের চিন্তারও ঘোর বিরোধী। স্তালিন পূজার অর্থ স্তালিনের ভুল ভ্রান্তি অপরাধ, বিশেষ ক'রে স্তালিন চিন্তার গোঁড়ামীর (dogmatism) দিকটি হয় উপেক্ষা করা, নয় সেগুলিকেই মার্কসবাদ বলে ধরে নেওয়া। আমাদের দেশেও এক ধরনের মার্কসবাদী আছেন যারা এক নিঃশ্বাসে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এবং স্তালিন, এমন কি মাও সে-তুঙের নাম উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত। এঁরা অতি বাম-বলে পরিচিত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মাওবাদীরা, নকশালপন্থীরা, এস ইউ সি প্রভৃতি। এঁরা নিজেদের চিন্তার গোঁড়ামী ও স্থূলতার সমর্থন খোঁজেন স্তালিন চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলির মধ্যে।

আমরা চাই, স্তালিন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলুক। আমরা চাই, প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুক। আমরা চাই, এই আলোচনা এমন নীতিনিষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে মার্কসবাদের নামে স্তালিন আমলে যে গরল উদ্গত হয়েছিল তাকে সমূলে উৎখাত করা যায় এবং মার্কসবাদের সৃষ্টিশীল বিকাশের ধারাটি অব্যাহত থাকে।

আমরা মনে করি, স্তালিন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, তিনি ছিলেন লেনিন পরবর্তীযুগের সোভিয়েত কর্ম-কাণ্ডের সব চেয়ে প্রভাবশালী সংগঠক, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। কিন্তু তিনি কোনো দিক থেকেই লেনিন নন। ভুললে চলবে না যে তাঁর কাজকর্মের জন্য সোভিয়েত ব্যবস্থার সাময়িকভাবে বেশ ক্ষতি হয়েছিল। তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর ভুলভ্রান্তি ঔপনিবেশিক দেশ সমেত প্রত্যেকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেই বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

আমাদের মতে স্তালিনের চেয়েও সোভিয়েত বিপ্লব অনেক বড়। সোভিয়েত বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে স্তালিন যেদিকে সাহায্য করেছেন

* প্রবন্ধটির অনুবাদ পরবর্তীকালে "বেইনক্রিম"-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা সেই দিকটিকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। আবার, স্তালিন চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলি, বিশেষ করে স্তালিন চরিত্রের গোঁড়ামীর দিকটির প্রতি আমরা তীক্ষ্ণ সমালোচনার পক্ষপাতী।

কাজেই স্তালিনকে বরবাদও নয়, আবার স্তালিন পূজাও নয়। স্তালিন চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন একটি আন্তর্জাতিক কর্তব্য। একমাত্র মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের শিক্ষার প্রতি অনুগত থেকেই এই কাজে সার্থকভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

স্মৃতিকথা*

সরোজ রায়

কমরেড পবিত্র রায় নিজেই ছিলেন যেন একটি Institute (প্রতিষ্ঠান)। বহু পুরাতন বিপ্লবীরা মাঝে মাঝেই জমা হত পবিত্রকে কেন্দ্র করে, নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় ভরে উঠত কয়েকটা দিন। এদের মধ্যে কেউবা কোনো দলের সভ্য ছিলেন, কেউবা ছিলেন না, তবে সকলেই ছিলেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী।

আজ অবশ্য এই আলোচনা বিষয়বস্তু নয়, প্রয়োজনবোধে অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই আলোচনা করা যাবে।

গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৭৯, বুধবার রাত্রি ৯টা ২৭ মিঃ সময় কমরেড পবিত্র রায় আমাদের ছেড়ে চলে যান।

গত কয়েক বছরই তাঁর শরীর ছিল খারাপ। শেষের দিকে সে দুরারোগ্য আক্রান্ত হয়। তাতেই তাঁর জীবন অবসান হয়।

ছেলেবেলা থেকেই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই পবিত্র রায়ের জীবন গড়ে উঠেছিল। তাঁর জন্মস্থান, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া শহরে। তাঁর বাবা তখানকার সরকারী স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক ছিলেন। পবিত্ররা ছিল তিন ভাই এক বোন। অতি অল্প বয়সেই ওদের মা মারা যান। বলা যায় তখন থেকেই শুরু হয় নানা সংকটের মধ্য দিয়েই ভাই-বোনদের জীবনযাত্রা।

ছাত্র জীবনেই পবিত্র বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেয়। ১৯৩২ সালের বিখ্যাত "উত্তরবঙ্গ ষড়যন্ত্র" মামলায় পবিত্র তার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। ওই মামলায় পবিত্রর দিদি "শান্তিদি"ও ধরা পড়েন। বর্তমানে শান্তি প্রধান, সুধী প্রধানের স্ত্রী।

ওই মামলায় পবিত্রর ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালীনই পবিত্র রায় অন্যান্য কারাবন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

* প্রয়াত কমরেড পবিত্র রায় স্মরণে

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করে। তখন দেশে ওইসব বিষয়ের পুস্তক প্রায় সবই ছিল বে-আইনী। বহু কষ্টে বাইরে থেকে ওইসব বই গোপনে এনে পড়াশোনার ব্যবস্থা হত। ঐ বিষয়ে পবিত্র রায় ছিল অগ্রণী।

আলিপুর কেন্দ্রীয় জেলের যে প্রিন্টিং প্রেস ছিল তার ১৬ নং বে Bay ছিল এইসব কমরেডদের একসঙ্গে জড়ো হওয়া ও আলোচনা করার জায়গা।

ঐ সময়ে যারা এক সঙ্গে মার্কসবাদ লেনিনবাদ নিয়ে পড়াশোনা ও আলোচনা করত, তাদের মধ্যে ছিল যতদূর মনে আছে প্রয়াত জ্যোতির্ময় সেন, স্বদেশ দাস, দেবকুমার দাস—আজও যারা বেঁচে আছে তার মধ্যে ছিল, হীরেন দত্তগুপ্ত, সুধী প্রধান, সুনেত্র সেন, সরোজ রায় ইত্যাদি।

জেল খানাতেই পরে গোপনে একটা "কমিউনিস্ট কনসোলিডেস" গঠন করা হয়, এবং বাইরের বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়।

যখন প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদ বিখ্যাত মিরাট মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর কিছুদিন বর্ধমান জেলে ছিলেন, তখন কমরেড পবিত্র রায়ও বর্ধমান জেলে থাকায়, কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদের সাথে থাকার সুযোগ পেয়েছিল; ঐ সময়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পবিত্রর পক্ষে একজন যোগ্য কমিউনিস্ট হওয়ার অনেক শিক্ষাই গ্রহণ করার সুযোগ হয়।

পবিত্র রায় জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে ছিল। ওই সময়ে বাংলা দেশের সমস্ত জেলের অভ্যন্তরে চলেছে বিপ্লবীদের সংগ্রাম, জেলের আইনকানুন বদলের দাবী, রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ অধিকার ও মর্য্যাদা আদায়ের সংগ্রাম। প্রধানতঃ এই সংগ্রাম তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীরাই শুরু করে। তাদের অবস্থাই ছিল চরম খারাপ, দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা অনেক সুখ-সুবিধা পেত।

কিন্তু পবিত্র রায়ের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরাও তাদের সুখ-সুবিধাকে তুচ্ছ করে, রাজনৈতিক বন্দীদের ঐ সংগ্রামে সামিল হল। ফলে জেলের শাস্তি হিসাবে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী নাকচ করে দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী করে দেওয়া হল, তাদের সব বিশেষ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর

পবিত্র রায়, হীরেণ দত্তগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় সেনকে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। মেদিনীপুর কারাগার তখন খুবই জঘণ্য ধরনের কারাগার। ওখানেও তখন চলছে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের সংগ্রাম ঐ একই দাবীতে। পবিত্ররাও এসে ঐ সংগ্রামে যোগ দেয়। শুধু সামিল হল বললেই হয় না, পবিত্র রায় এই সংগ্রামে বিশেষ নেতৃত্বের স্থান অধিকার করে। তখন জেল-আইন অনুযায়ী জেলের সমস্ত রকম পাশবিক অত্যাচার বন্দীদের উপর চলছে। "পিনালডারেট", "চট কাপড়", ডাণ্ডাবেড়ী, Cross barfetters ; Standing handcuff, Night handcuff, চাবুক মারা, মাঝে মাঝে পাগলা ঘুন্টি দিয়ে অমানুষিক মারপিট, নতুন করে সাজা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

তখন মেদিনীপুর জেলের সুপারিনটেণ্ডেন্ট ছিল মেজর কাটারিয়া, যুদ্ধ ফেরৎ অফিসার, তারও জেদ বাংলাদেশের বিপ্লবীদের ঠাণ্ডা করতেই হবে। তার জন্য তার নানা কায়দা। কয়েকজন যারা এই ন্যায্য সংগ্রামে যোগ দেয়নি তাদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার শুরু হল, যেন ঘরজামাই, তাদের জন্য মাছ, মাংস, দুধ, কলা, সন্দেশ, সরু চালের ভাত, চা, রুটী, ফল আরও অনেক লোভনীয় খাবার ও লোভনীয় ব্যবহার। আর অন্যদিকে সংগ্রামীদের ঐ অবস্থা।

এত কাণ্ডের পরেও মেজর কাটারিয়া যখন দেখল এরা "Undaunted" তখন একদিন আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করে বলে যায় যে "তোমরা যখন কোন আইন মানবে না তখন আমি জেলকে "মিলিটারি অথরিটীর" হাতে তুলে দেব। তবে তোমাদের চিন্তা করার আরও একবার সুযোগ দেব।

তার পরদিন আমাদের কয়েক জনকে "কেস টেবিলে" ডাকা হল।

নানা প্রশ্ন, পবিত্র রায়কে কাটারিয়া জিজ্ঞাসা করে যে "তুমি কি লাল ঘোড়াতে চড়তে চাও ?" জেলখানার ভাষায় চাবুক মারার যে যন্ত্র তাকে লাল ঘোড়া বলা হয়। পবিত্র রায় এর অর্থ বুঝে উত্তর দেয় "আমার জন্মস্থান আসামে, আমি হাতিতে চড়তেই ভালবাসি—দরকার হলে হাতিতেই চড়ব।" মেজর কাটারিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে "তুমি হাতি কাকে বলছ ?" পবিত্র জিজ্ঞাসা করে "তুমি লাল ঘোড়া বলছ কাকে ?" তখন মেজর কাটারিয়া তার পাশে দাঁড় করানো চাবুক মারার লোহার ফ্রেমটা দেখিয়ে দেয়। তখন

কমরেড পবিত্র দূরে অবস্থিত ফাঁসির মঞ্চের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে "ওটাই আমার হাতি", তখন কাটারিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অথবা হতাশ হয়ে সিপাই ডেকে বলে—"লে যাও সেলমে—they are undaunted"

এমন কত ঘটনাই আজ মনে পড়ছে, Undaunted পবিত্রর জেল জীবনের অনেক ঘটনাই মনে পড়ে।

দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েই পবিত্র তার কার্যক্ষেত্র বেছে নিল আসাম প্রদেশ। আসামের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সে ছিল অন্যতম নেতা।

আসামের দরিদ্র উপজাতি কৃষকদের মধ্যেই ছিল তার প্রধান কাজ ও তাদের বিষয় জানার জন্য পবিত্র রায়ের ছিল অপরিসীম প্রচেষ্টা এবং ঐবিষয় সে জানতও অনেক।

১৯৪০ সালে আসাম সরকার তাকে আসাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পবিত্র চলে আসে কলকাতায়।

কলকাতায় আসার পর সে কলকাতার পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করে।

ওই সময়ে পার্টির বহু নেতা ও কর্মীদের গোপন অবস্থায় চলে যেতে হয়। ওই সময় কমরেড মুজাফ্ফর আহমদকেও গোপনে চলে যেতে হয়। তখন থেকেই তাঁর নাম হয় "কাকাবাবু"। এই সব কমরেডদের গোপন আস্তানার ব্যবস্থা বেশীরভাগই পবিত্র রায় করত। আজও এই সব ঘটনা অনেকেই ভোলে নি। এই দায়িত্বশীল কাজে পবিত্র রায় ছিল অতুলনীয়।

শুধু তাই নয়, যখনই পার্টির কোনো কমরেড বা পার্টিকে গোপনে চলে যেতে হত, তখনই দেখা যেত পবিত্র রায়ের দায়িত্ব, সেই অনেকের গোপনে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করত।

ইতিপূর্বেই পবিত্রকে বাধ্য হয়েই তার দুটি ছোট ভাই ও দিদিকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হল, তাদের থাকা-খাওয়ারও কোন ব্যবস্থা ছিল না।

আমাদের পুরাতন বন্ধু কমরেড হীরেন দত্তগুপ্ত তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কার্ণার সিউটিকেল কোম্পানীর কাজ পরিচালনার ভার নিয়েছেন। পবিত্রকে ডেকে ওখানে একটা চাকরী দেওয়া হয়। তখন পবিত্রদের আর্থিক অবস্থা চরম সংকটাপন্ন।

১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হবার পর আবার পবিত্র রায়কেই নিতে হল প্রাদেশিক পার্টির টেকনিকেল বিভাগের অন্যতম জরুরী দায়িত্ব। তার ঘাড়ে পড়ল কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, তাদের গোপন জায়গায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদির গুরুদায়িত্ব। যতদূর জানা যায়, সে তার কাজ অত্যন্ত তৎপরতা ও কৃতিত্বের সঙ্গেই করে যেত।

শেষদিকে সেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই সে তদানীন্তন পার্টি নেতা মুজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে।

যদিও পরবর্তীকালে তার সঙ্গে পার্টির সাংগঠনিক সম্পর্ক রইল না, কিন্তু সে পার্টির রাজনীতি ও কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলত।

পবিত্রর লেখার অভ্যাস ছিল না, সে ছিল Voracious পাঠক। বিভিন্ন বিষয়ে তার ছিল গভীর জ্ঞান।

মনে পড়ে ১৯৬২ চীনের ভারত আক্রমণের পর যখন পার্টির মধ্যে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যে, চীন আক্রমণকারী না আক্রমণকারী নয়। তখন আমরা কয়েকজন কোন কারণে পবিত্রর বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং ওই জরুরী বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনায় পবিত্র পরিষ্কারভাবে বলে যে "চীনের নেতারা মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেছে—এদের নীতি জাতীয়তাবাদী, তার ফলে তারা আজ সম্প্রসারণবাদী।"

বহু ঘটনায় তার চিন্তাধারার গভীরতার বিষয় আজও মনে পড়ে। ১৯৬২ সালে আমরা অনেকেই গ্রেপ্তার হলাম "চীনের সমর্থক" হিসাবে। পশ্চিম-বাংলার জেলগুলো ভরে গেল। বেশীসংখ্যক কমরেডরাই ছিল দমদম কেন্দ্রীয় কারাগারে। ওখানেই চীনের বিষয় নিয়ে, সোভিয়েতের বিষয় নিয়ে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে নানা আলোচনা হত।

একদিন ওই জেলে বসেই আমরা কয়েক জন কমরেডদের মধ্যে আলোচনা হয় যে বাইরে গিয়ে প্রধানত মার্ক্সীয় তত্ত্বগত বিষয়ের আলোচনার জন্য একটা পত্রিকা বের করা উচিত। ঐ আলোচনায় ছিলেন কমরেড নরহরি কবিরাজ, নির্মালা বাগচী, দেবেন দাস, সরোজ রায় এবং আরও ২।১ জন।

আলোচনায় বেরিয়ে এলো যে অনেক টাকার দরকার তার ব্যবস্থা কি হবে?

আমার তখন পবিত্র রায়ের কথাই বড় করে মনে হয়, আমি তখন

বলি যে কাগজ চালানর অন্যান্য ব্যবস্থা আপনারা নেন, আমি টাকার ব্যবস্থা করব।

আমরা জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর পবিত্রর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনা করি; পবিত্রও উৎসাহ দেখায়, ফলে প্রথম দিকে যে ব্যবস্থা ও টাকার দরকার হয় তার অনেকখানি গুরুদায়িত্ব পবিত্র রায় নিতে স্বীকার করে ও বলে সাধ্যমত অন্যান্য বিষয়েও সাহায্য করবে।

পত্রিকা প্রকাশ করা ঠিক হয়ে গেল। পত্রিকার নাম হল "মূল্যায়ন"। পবিত্রর জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত "মূল্যায়নের" সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আজও "মূল্যায়ন" প্রকাশ হয়ে চলেছে—আশা করা যায়, শত শত বন্ধুদের সহযোগিতায় "মূল্যায়ন" চলবে, যা বহন করে চলবে—কমরেড পবিত্র রায়ের বিপ্লবী-স্মৃতি।

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক তাৎপর্য

রণধীর দাশগুপ্ত

সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস যেমন ৩৫১টি আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেছে, তেমনই বামপন্থীরাও তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ষষ্ঠ লোকসভায় বামপন্থীদের শক্তি ছিল ৪২ জন। আর সপ্তম লোকসভায় তাদের শক্তি হয়েছে ৫৩ জন। আসাম সমেত এখনও বামপন্থীদের ৭টি আসনে নির্বাচন বাকী আছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বুর্জোয়া সরকারের বিরোধী পক্ষ ছিল প্রধানত বুর্জোয়া পার্টি। কিন্তু এবার বুর্জোয়া শাসক দলের প্রধান বিরোধী পক্ষ হয়ে দাঁড়াল মেহনতি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি বামপন্থী শক্তি জোট। লোকসভার বাইরে শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিফলন হল এই বামপন্থী শক্তি জোট। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বিকাশের গতিমুখ। দ্বিতীয়তঃ ইন্দিরা হাওয়া সারা ভারতকে গ্রাস করতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালা ইন্দিরা কংগ্রেস সমেত সমস্ত বুর্জোয়া পার্টিকে পরাস্ত করেছে এবং ইন্দিরা হাওয়ার গতিবেগকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর একচেটিয়া শাসন ক্ষমতার সংকট। এই সংকট দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথের সংকটের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। এই লক্ষণ ক্রমবর্ধমান। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গণচেতনার অসম বিকাশ এই সংঘাতের আবরণ মাত্র। এই বিরোধ একটা মৌলিক বিরোধ। এটা বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে এবং ইন্দিরা কংগ্রেসসহ সমস্ত বুর্জোয়া পার্টির বিপক্ষে। বামপন্থী শক্তির যতই প্রসার ঘটবে এই বিরোধের তীব্রতাও ততই বাড়বে। এই বিরোধের অপর লক্ষণ হল একই সংবিধানের মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী সরকারের অবস্থান। ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে বামপন্থী সরকার সমূহের সংঘাত যেমন বাড়বে তেমনই বাড়বে সংসদের বাইরে শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই বিরোধগুলি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যে বাড়ছে এবং আরও দ্রুতগতি বাড়বে বলেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকটও আরও তীব্র হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই নির্বাচনী সাফল্য এই সব বিরোধ ও

সংকটকে আরও গভীর করে তুলবে। এটাই হচ্ছে বামপন্থী শক্তিসমূহের আরও ঐক্য ও সম্প্রসারণের ভিত্তি। অতএব এই নির্বাচন শ্রেণীসংগ্রামকে আরও তীব্র করে তুলবে।

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৮০ নিউ এজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সঠিকভাবে বলা হয়েছে যে "১৯৭৭-এর মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনের যেমন, ঠিক তেমনই ভাবে এই মাসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে, তিন বছর আগের রায়কে উল্টে দেওয়ার নাটক অভিনীত হল। আগেকার নির্বাচনটিতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্রোধের তরঙ্গশীর্ষে জনতা পার্টি ক্ষমতা দখল করেছিল। আর এবার জনতা দলের কুশাসন ও আর এস এস ও জনসংঘের ষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী কার্যকলাপের মিলিত, উপাদানের বিরুদ্ধে, জনসাধারণের গভীর অসন্তোষ, হতাশা ও ক্রোধের তরঙ্গে চড়ে একইভাবে ফসলের সম্ভার ঘরে তুলে ক্ষমতায় এসেছে ইন্দিরা কংগ্রেস। লোকদল কংগ্রেসের তথাকথিত ভোটের 'অন্তবর্তী কালীন সরকার' জনসাধারনের মনে আশা-ভরসা জাগাতে ও তাদের চোখে বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিভাত হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুত, ঐ সরকারের কিছু কিছু কার্যকলাপ ও চরণ সিং-এর কোন কোন প্রকাশ্য উক্তি ইন্দিরা গান্ধী ও তার দলের নির্বাচনী সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করতে সাহায্যই করেছে। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তিতে রচিত একটি বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব জাতীয় বিকল্পই শুধু ইন্দিরা কংগ্রেসের দিকে জোয়ারকে প্রতিহত করতে পারত। তারই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার নির্বাচনী ফলাফলে।

এই দুটি বিপরীত চিত্রের তাৎপর্য ও তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব যেন কেউ অগ্রাহ্য না করেন।"

যতকাল পর্যন্ত সারা ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি শক্তিশালী হবে না ততদিন পর্যন্ত এই বিপরীত চিত্রের অবসান ঘটবে না। স্বভাবতই ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ এবং জনতা পার্টির কুশাসন, আত্মঘাতী কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত জনসাধারণের ক্ষোভ ও অরাজকতার মধ্যে থেকে স্থায়ী সরকারের স্লোগান জনসাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। সাধারণ মানুষ মনে করেছে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই স্থায়ী সরকার গঠন করতে সক্ষম। এই কারণে কংগ্রেস (ই) শতকরা ৪২·৫৮ ভাগ মাত্র ভোট পেয়ে ৬৬·৮৫ ভাগ অর্থাৎ ৩৫১টা আসন পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস (ই) ভোটদাতাদের অর্ধেক ভোটও পায় নি,

অথচ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিত্ব গঠন করেছে। যে সরকার ভোটদাতাদের অর্ধেকের অনেক কম ভোট পায় সেই সরকার কী করে স্থায়ী হতে পারে? কেবল আসনের সংখ্যা দিয়ে সরকারের স্থিতিশীলতা বিচার করা যায় না। জনতা পার্টির সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু সেই সরকার আড়াই বছরের বেশী দেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে নি। সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টি মাত্র ৩২টি আসন লাভ করেছে। তার মধ্যে জনসংঘ এবং আর এস এস কমবেশী মাত্র ১২টি আসন পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার পরাজয় ঘটেছে কিন্তু বাইরে তাদের অন্তর্ঘাতমূলক শক্তি বিশেষ হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বৈরতন্ত্র স্থিতিশীল সরকার গঠনের স্লোগান নিয়ে জনতা পার্টির কুশাসনের সুযোগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় স্বৈরতান্ত্রিক এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি পরাজিত হয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টি শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ভোট পেয়েছে। এখানে ভোটের দিক থেকে বামশক্তি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তেমনই লাভ করেছে আসনের দিক থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আর সারা ভারতে ইন্দিরা কংগ্রেস শতকরা ৪২·৫৮ ভাগ ভোট পেয়ে ৬৬·৮৩ ভাগ আসন লাভ করেছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালার বামপন্থী শক্তি যে-কোন বুর্জোয়া পার্টি থেকে যে অনেক শক্তিশালী তা ভোটযুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে। এটাই হল ভারতের ঘটনাবলীর বিকাশের গতি। আবার এই তিনটা রাজ্য বাদে ভারতের অন্যত্র ইন্দিরা কংগ্রেসের বিজয় বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য শক্তির দুর্বলতার পরিচয়। ঐ সব রাজ্যে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বামপন্থী শক্তির প্রভূত পরিমাণে উন্মেষ হয় নি। যার ফলে স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এখনও কোন জাতীয় বিকল্পের শক্তি দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। অন্যদিকে এটা মেহনতী মানুষের শ্রেণীগত দুর্বলতারও লক্ষণ যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে ইন্দিরা কংগ্রেস এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে অন্যান্য পার্টি সমূহ।

কংগ্রেস (ই) র লক্ষ্য

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন—"আমাদের লক্ষ্য হল আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন ভারত গঠন; আমাদের প্রধান শত্রু হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার এবং এর জন্য স্থায়ী সরকার গঠন করা প্রয়োজন।

এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তিনি কোন পথ গ্রহণ করবেন? স্বভাবতই তিনি অতীতের মত ধনতান্ত্রিক পথই অনুসরণ করবেন। বিগত ১১ বছর তাঁর শাসনকালে তিনি এই পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁর শাসনকালে দেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি এ কথা কেউ বলবে না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনের সংকটও বেড়েছে। সেই সংকট হল ধনতান্ত্রিক পথের সংকট। এই সংকট বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সংকটের অংশ বলে সেই সংকটের তীব্রতা আরও বেড়েছে। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের মত আমাদের দেশে পণ্যমূল্যের দর অবিরাম গতি বেড়েছে, বেকার সমস্যা তীব্র হয়েছে, পরোক্ষ ট্যাক্স ও নানাবিধ শুল্ক বেড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে, শিল্পজাত পণ্য ও কৃষিজাত পণ্যের দরের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে, কৃষকেরা কৃষি পণ্যের দর পাচ্ছে না ইত্যাদি। ১৯৭৮ সালে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ যা অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশের লোক সংখ্যার থেকে বেশী। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫৪ লক্ষ এবং ১৯৭৮ সালে সেই সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬১ লক্ষ। তার মধ্যে ২৬ হাজার হল ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রায় ১৪ হাজার হল ডাক্তার। এটা হল ধনতান্ত্রিক সংকটের একটা বিশেষ লক্ষণ এবং বিশ্বপুঁজিবাদী দেশে একটা ক্রমবর্ধমান সার্বজনীন ঘটনা। মুদ্রাস্ফীতির আংকিক সংখ্যাও কম নয়। ১৯৬৪ সালে টাকার পরিমাণ ছিল ৩১০৪ কোটি। আর ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩,০১৮ কোটি টাকায়। ১৯৬৪ সালে পাইকারী গড়পড়তা দরের মান সংখ্যা ছিল ৬৭। আর ১৯৭৯তে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৯। ১৯৬২ সালে শতকরা ৪০ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। বর্তমানে সেই সংখ্যা হয়েছে শতকরা ৪৭ জন।

আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জমিদারী প্রথা বিলোপ হলেও কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক প্রবল। একদিকে যেমন কৃষকের স্বার্থের বিনিময়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশে সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে ভূমি সংস্কারকে বানচাল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সরকারের হাতে ২১৫ লক্ষ একর জমি রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর শাসন কালে তার মধ্য থেকে মাত্র ১৩ লক্ষ একর জমি কৃষকের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। আজ কৃষকেরা কেবল জমি থেকে বঞ্চিত হয় নি, তারা

সামন্ততান্ত্রিক এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণের শিকার হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, আর কৃষিপণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজি ও বড় বড় ফড়িয়াদের শোষণ—এটাই হচ্ছে কৃষকের অবস্থা। কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার কোন বুর্জোয়া সরকার সমাধান করতে পারে না, এবং ইন্দিরা গান্ধীও পারবেন না।

শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির কেন্দ্রীয়ভবনও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর যেমন মুনাফা বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে সম্পদের পরিমাণ। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে তার চিত্র পাওয়া যাবে।

একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নাম	কোটি টাকায় সম্পদের পরিমাণ ১৯৭২	১৯৭৭	১৯৭২ সালের তুলনায় '৭৭-এর শতাংশ বৃদ্ধি
বিড়লা	৫৮৯·৫০	১০৭০·২০	৮১·৬
টাটা	৬৪১·৯৩	১০৬৯·২৮	৬৬·৬
মফৎলাল	১৮৩·৭৪	২৮৫·৬৩	৫৫·৪
জে, কে, সিংহানিয়া	১২১·৪৫	২৬৭·৩১	১২০·১
থাপর	১৩৬·১৬	২১৫·৯২	৫৮·৬
আই সি আই	১৩৫·২১	২০৯·১৭	৫৫·৩
সিঙ্ঘিয়া	১০৭·৭৩	২০০·০৪	৮৫·৭
অয়েল ইণ্ডিয়া	১০৪·০৪	১৯৯·২৫	৯২·২
ভিয়াণ্ডিওয়ালা	৪৫·৯১	১৮১·৪৪	৩১২·৬
বাঙ্গুর	১২৫·২৬	১৮৮·২৪	৫০·৩
লারসন টুব্রো	৭১·০৩	১৮৫·১১	১৩৫·৩
শ্রীরাম	১২০·৭৭	১৭১·৭৭	৪৮·১
এ সি সি	১৩৪·৩৬	১৬৮·৮৬	২৫·৭
কির্লোস্কর	৮৬·৪৬	১৬০·২৬	৮৬·২
হিন্দুস্থান লিভার	৭৭·৮৭	১৪৩·৫১	৮৪·৪
খাটাউ (বোম্বে)	৭৫·৪৪	১৩৮·৮২	৮৪·০
সরাভাই	৮৪·৪৪	১৩৬·২৬	৬২·৩
ওয়ালচাঁদ	৯৯·৪৭	১৩২·৮১	৩৩·৫
ম্যাকলিন মেগর	৬৪·৮০	১৩২·৫৫	১০৪·৬
মাহিন্দ্র এণ্ড মাহিন্দ্র	৫৮·৪৯	১২৫·৪৯	১১৪·৫
	৩০৭১·৯৮	৫৪০১·৭০	৭৫·৮

স্বাধীনতা অর্জনের সময় বিড়লার সম্পদ ছিল ২৫ কোটি টাকা এবং এখন তা স্ফীত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১০২০ কোটি টাকা। ১৯৪৭ সালে টাটার সম্পদ ছিল প্রায় ৪০ কোটি টাকা কিন্তু এখন তার মোট সম্পদ হল ১০৬৯ কোটি টাকা। এরকম আরও ১১০টি কোম্পানী আছে যার সম্পদ ২০ কোটি টাকার উর্দ্ধে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সত্ত্বেও এইসব একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্প, বাণিজ্য, ঋণদানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। এইসব একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন দেশী পুঁজিপতিরা রয়েছে তেমনই রয়েছে বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাও।

ধনতান্ত্রিক সংকট যেমন গভীর ও ব্যাপক হচ্ছে, তেমনই পুঁজির কেন্দ্রীভবনও বাড়ছে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী করে সমাধান করবেন? ১১ বছর যাবৎ তিনি যে ধনতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেছেন, জনতা পার্টিও তাদের শাসনকালে একই নীতি অনুসরণ করেছে। এই নীতির ফলে উৎপাদনীশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষকের মধ্যে বিস্ফোরণ অনিবার্য। চরম দমননীতি সত্ত্বেও এই বিস্ফোরণকে রোধ করা অসম্ভব। অতএব ৩৫১টা আসন পেলেই কী করে সরকার স্থিতিশীল হবে? ধনতন্ত্রই যদি স্থিতিশীল না হয়, বুর্জোয়া সরকার কী করে স্থিতিশীল হতে পারে? জনসাধারণকে দমন করে, তাদের দারিদ্র্যকে ক্রমবর্ধমান হারে পুঞ্জীভূত করে এবং একচেটিয়া পুঁজির কেন্দ্রীভবনকে স্ফীত করে জাতিকে ও দেশকে স্বনির্ভরশীল করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেও দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনীশক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ সমাধান করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করলে, দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করতে হয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থে চায় যে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করুক। কংগ্রেস (ই)র পক্ষে বিপুল ভোট ধনতান্ত্রিক পথের সমর্থনে ভোট নয়। জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ যে স্থায়ী সরকার চেয়েছে তা ধনতন্ত্রকে স্থায়ী করার জন্য নয়। আসন সংখ্যার দিক থেকে এই সরকারকে যতই স্থিতিশীল মনে করা হোক না কেন, ধনতন্ত্র যেহেতু স্থিতিশীল নয় এই সরকারও হতে পারে না। আসন সংখ্যার সঙ্গে এই বিরোধ ক্রমবর্ধমান।

কালক্রমে এই বিরোধ দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শ্রেণী-সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পরিস্থিতির চাপে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে এই সরকারের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হবেই।

এইসব সমস্যা হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যা। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশেরই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকুক না কেন তারা দেশের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। অতএব তাদের পক্ষে স্থিতিশীলতা সাময়িক। যে শক্তি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করবে সেই শক্তিই বাড়বে, স্থায়ী হবে এবং স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারবে। এখানেই হচ্ছে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ফ্রন্টের গুরুত্ব।

পরিস্থিতি এমনই যে ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই শক্তির সমাবেশের জন্য দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য অপরিহার্য এবং অবশ্যম্ভাবী। কারণ দুই কমিউনিস্ট পার্টি'র ঐক্য যেমন শ্রেণীসংগ্রামের প্রতীক, তেমনই গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমাবেশ করার বাহন। পশ্চিমবঙ্গে বাম ও কমিউনিস্ট পার্টি'র ঐক্য লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে উদ্দীপিত করেছে এবং কংগ্রেসকে প্রায় নির্মূল করেছে। সারা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি'দ্বয়ের ঐক্য একটা জাতীয় বিকল্প শক্তি জোট গড়ে তোলার হাতিয়ার। সারা ভারতে প্রধানতঃ দুই কমিউনিস্ট পার্টি'র মধ্যে ঐক্য গঠিত হয়েছে বলে লোকসভায় কমিউনিস্টরা যে শক্তি অর্জন করেছে তা আর কোনো সময়ে সম্ভব হয় নি। এই ঐক্যকে চোখের মণির মত রক্ষা করা প্রয়োজন এবং সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করা দরকার। দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা' সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। যতদিন যাচ্ছে ততই কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, বিশ্ব পরিস্থিতিতে শক্তি সমাবেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণকৌশলে প্রয়োগে কারা বন্ধু এবং এবং কারা শত্রু তাও পরিষ্কার হচ্ছে। দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য সাময়িক নয় বা কেবল নির্বাচনী মৈত্রী নয়। এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও তাৎপর্য আছে। প্রতিটি গণফ্রন্টে, রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ঐক্যকে সম্প্রসারিত করতে হবে। নির্বাচনে যৌথ অভিযান এই সত্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আরও দেখিয়ে দিয়েছে যে এবারে নির্বাচনে মেহনতী মানুষ যে সংগ্রামী চেতনা ও রাজনৈতিক দৃঢ়তা

দেখিয়েছে তা অভূতপূর্ব। এটা হচ্ছে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের ঐক্যের ফলশ্রুতি। যারা এখনও কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের কথা বলছেন তারা ভ্রান্ত। কারণ বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব দূরে থাক, জনগণের কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং বৃহত্তর ঐক্যের অক্ষশক্তিও হতে পারে না। এমনকি একাংশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা থাকলেও তারা আর জাতীয় নেতা বা মৌলিক শক্তি হতে পারে না।

আমাদের দুর্বলতা

এখনও সারা ভারতে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে নি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে তার পরীক্ষা-নিরিক্ষা হল মাত্র। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্যত্র দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য হলেও বামপন্থী শক্তি এখনও দুর্বল। বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেই সাধারণত বামপন্থী শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে। অন্যান্য রাজ্যে এখনও সেই পরিস্থিতি এমন হয় নি যাতে বামপন্থীরা একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা শক্তিশালী হলেও মধ্যবিত্ত এবং মাঝারী কৃষকদের মধ্যে দোদুল্যমানতা পরিলক্ষিত হয়েছে নানা কারণে। গরীব মেহনতী মানুষেরা যেমন দৃঢ়ভাবে সমস্ত কুৎসা ও প্রচার অগ্রাহ্য করে বামফ্রন্টকে ভোট দিয়েছে তেমনই মধ্যবিত্তরা ও মাঝারী কৃষকেরা বিভক্ত হয়েছে। কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে মেহনতী মানুষের ভোট কম পেয়েছে বলে তাদের ভোটের শতাংশ ৩৪ এর বেশী হয় নি। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত কৃষকসমাজ এখনও বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব এখনও তাদের মধ্যে প্রবল।

একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বাদে সারা ভারতে কোনো শিল্পাঞ্চল অধ্যুষিত নির্বাচনী কেন্দ্রে বামপন্থীরা প্রার্থী দিতে পারেন নি। আর দিতে পারলেও কোনোটাতে জয়লাভ করতে পারে নি। জামশেদপুরের মত ভারী শিল্পনগরীতে আমাদের প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। কোন ভারী শিল্প অধ্যুষিত নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বামপন্থী বা কমিউনিস্টরা নির্বাচিত না হওয়ার ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হয়েও শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব কম। শ্রমিকশ্রেণীর

শ্রেণীচেতনার থেকে তাদের ওপর বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাব সাময়িক হলেও এখনও বেশী। এটা একটা গুরুতর ঘটনা যা বামপন্থীদের লক্ষ্য করা উচিত। সর্বত্রই আমরা যা ভোট পেয়েছি, অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ বাদে, তা প্রধানত গ্রামীণ জনসাধারণের। অথচ অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে ও সংগঠিত করতে না পারলে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তোলা কঠিন। অথচ এই ঐক্য ব্যতীত আমাদের কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না এবং বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যও গড়ে উঠবে না। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের শ্রেণীগত ভিত্তি হল শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। এটা হল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক শক্তি, যে শক্তি স্বৈরতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদকেও পরাস্ত করতে পারে। দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য এবং বামপন্থীদের ঐক্যকে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এটা হল আগামী ভবিষ্যতে আমাদের গুরুদায়িত্ব।

এশীয় ভূখণ্ডে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার প্রশ্ন

তৃতীয় দুনিয়ার, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের তথা স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পথ নিয়ে মার্কসবাদী মহলে কোনো মতান্তর থাকা উচিত নয়। তাদের সামনে রয়েছে লেনিন সূত্রায়িত অপুঁজিতান্ত্রিক পথের রূপরেখা, যা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে। কিন্তু দেশ ও কালের তারতম্যে তার রূপায়ণভেদ ; রণনীতি ও রণকৌশল নিয়েও মতান্তর। এ মতান্তরের একটা বিশেষ কারণ সম্ভবত এ দেশগুলির আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়াকে সৃজনশীলতা দিয়ে দেখার অক্ষমতা। অধ্যাপক নীহার সরকার তাঁর সমীক্ষামূলক গ্রন্থে* এই ছকে-বাঁধা পথে এশিয়ার সামাজিক কাঠামো ও উন্নয়নগত রণনীতি বিশ্লেষণ করেন নি, সৃজনশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দেশগুলির রূপান্তর ও তার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাঙ্গারীর অর্থবিজ্ঞানী টমাস সৃজেনটেস ছকে-বাঁধা পথে ('dogmatic-schematic trend') আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণের বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, পরিবর্তমান বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অন্তরায় এ পথ ত্যাগ না করলে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বীক্ষা সম্ভব নয়।** অধ্যাপক সরকারের বিশিষ্টতা এখানে যে তিনি সেই ছকে-বাঁধা বন্ধ্যা পদ্ধতিকে সযত্নে অস্পৃশ্য রাখতে পেরেছেন।

মার্কস, কথিত এশীয় উৎপাদনী ধারার বাস্তবতা ও যাথার্থ্য বিচার তাঁর সমীক্ষার সূত্রপাত। নয়া সাবেকী অর্থ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, শিল্পায়ন নীতির গলদই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বন্ধ্যাত্বের কারণ। লেখক প্রারম্ভেই

---

* N. K Sarkar : Social Structure and Development Strategy in Asia , People's Publishing House. New Delhi, 1978 (p 298+xiv) Rs 40/-

** Thomas Szentes : Interpretations of Economic Underdevelopment, Budapest 1969 (p 4)

এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলেছেন এবং লিখেছেন যে, এর কারণ এশীয় সমাজগুলির সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের কার্যকারণ। এজন্য তিনি এশীয় উৎপাদনী ধারা থেকে সূত্রপাত করে সমগ্র প্রক্রিয়াকে বিচার করেছেন। এশীয় উৎপাদনী ধারা এক স্বতন্ত্র উৎপাদনী সম্পর্ক ছিল কিনা এবিষয়ে মার্কসবাদী মহলে বিতর্ক বহুদিনের। এশীয় উৎপাদনী সম্পর্ক সংজ্ঞায়নে মার্কস ও এঙ্গেলস তথ্য সংকলন করেছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রশাসকদের বৃত্তান্ত থেকে—যে ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বিকৃতির সঙ্গত অভিযোগ আছে। এঙ্গেলস নিজেই বলেছেন যে, সনাতনী এশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য ছিল না। মার্কসেরও সংশয় ছিল একটি অভিমত সম্পর্কে : প্রাচ্যসমাজে জমিজমার মালিকানা ছিল না (পৃঃ ৬-৭)। লেখক এ-সকল বিষয়ে মুক্তচিত্তে আলোচনা করেছেন, যা তাঁকে এশীয় উৎপাদনী সম্পর্ক বিষয় কিছু কিছু বিকৃত ব্যাখ্যার জবাব দিতে সাহায্য করেছে। যেমন মার্কস-বর্ণিত 'অপরিবর্তনীয়' এশীয় উৎপাদনী সম্পর্ককে অনেকে বলেন 'অস্বাস্থিক : বন্ধ্যা ও স্থাবর সমাজ।' অধ্যাপক সরকার বলেছেন অপরিবর্তনীয় বলতে এক ধরনের ভারসাম্য বোঝায়, যেজন্য একে স্থাবর নয়, জঙ্গম ব্যবস্থা বলতে হবে—এ এক গতিশীল ভারসাম্য যার যোগসূত্রে আছে বিবিধ ধর্ম, জাতি ও উপজাতি। কোনো কোনো সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদের মতে এশীয় উৎপাদনী সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেরই আঞ্চলিক রকমফের।

এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির আর্থ-সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা। স্বভাবতই, ভারতের আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা এখানে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর স্বয়ম্ভব হবার প্রধান অন্তরায় হল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ কর্তৃক এক দ্বৈত ঔপনিবেশিক আর্থব্যবস্থা নির্মাণ যা এশীয় দেশগুলির কৃষি-শিল্প ভারসাম্যকে ভেঙ্গে দিয়েছিল (পৃঃ ৪১)। তিনি বলেছেন : "আমরা ভারতে যা দেখছি, তা এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির উপর পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি আরোপন, যাতে জাতিপ্রথা এক প্রধান নির্ণায়ক। এই আরোপণ জাতিগত কাঠামো তৈরী করেছে, উচ্চবর্ণসমূহ ক্রমে ক্রমে একে অন্যের মধ্যে মিশে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয়েছে (পৃঃ ২৭)। অধ্যাপক সরকার অবশ্য এই সমাজব্যবস্থাকে বলেছেন পরম্পরাগত (hierarchical) সমাজ। আমরা মনে করি যে, একে বলা

উচিত বহুস্তর কাঠামোবিশিষ্ট (multistructural) সমাজ। তিনি নিজে যদিও সোভিয়েত গবেষকদের সংজ্ঞায়িত 'বহুস্তর কাঠামো, প্রয়োগের যাথার্থ্য স্বীকার করেছেন (পৃঃ ৫২), কিন্তু তাঁর বক্তব্য এই যে ঔপনিবেশিক ও নয়া-ঔপনিবেশিক কাঠামোকে দ্বৈত কাঠামো অভিহিত করাই সঠিক। বহুস্তর কাঠামো বললে বোঝা যায়, পুঁজিতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এক বা একাধিক কাঠামোর সহাবস্থান—যার মধ্যে ঐক্য ও বিরোধ উভয়েই বিদ্যমান। লেখক বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পরম্পরাগত কাঠামোর আর বৈষম্য যেমন সম্পদসৃষ্টিতে যথাযথ গতি সঞ্চালনে ব্যর্থতা আনে, বেকার সৃষ্টি করে এবং দ্বৈত বিপণন কাঠামো থাকায় মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য, কারণ আমাদের দেশে পশ্চিমী অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়, সে সকল তত্ত্ব সুষম বাজারে প্রযোজ্য, আর এসব দেশে বাজার বিষম, দ্বৈত-কাঠামোবিশিষ্ট।

পশ্চিমী দুনিয়ার অনেক অর্থবিজ্ঞানী আছেন যারা তৃতীয় দুনিয়ার অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ বলে ঢক্কানিনাদিত—যেমন ডব্লু এ লুইস, (১৯৭৯-এ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত), অস্বৈসকু-রোগেন, ফেই, র‍্যানিস প্রভৃতি। অধ্যাপক সরকার এ সকল তত্ত্বের অসারতা দেখিয়েছেন এবং এসব অর্থবিজ্ঞানীদের প্রধান ত্রুটি এদেশগুলির আর্থ-সামাজিক বিকাশধারা অবলোকনে অক্ষমতা। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যে, লুপ্ত কৃষি শিল্প ভারসাম্য পুর্ণপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় সুসমন্বিত, সুষম ও সমতা অভিমুখী শিল্পায়ন—যে অভিমত মরিস ডব, অস্কার লাঙ্গে বা ইগনাসি স্যাকস-এর ধারণার সমীপবর্তী। কারণ আর কিছুই নয়, শিল্পায়ন এমনই এক গতিশীল প্রক্রিয়া যাতে কৃষি উন্নয়নের তুলনায় উচ্চতর হারে সঞ্চয়-সৃষ্টি হতে পারে। (পৃঃ ৪৮-৪৯)।

প্রসঙ্গত তিনি ভারতের উন্নয়ন পথ নিয়েও তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্বভাবতই ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার কথা তুলেছেন। বহু আলোচিত ও বিতর্কিত মহলানবীশ যোজনার সূত্রের আলোচনা করেছেন যা এককালে সাম্রাজ্যবাদী ও দক্ষিণপন্থী অর্থশাস্ত্রজ্ঞদের সমালোচনাস্থল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছেন: "তত্ত্বগত সীমাবদ্ধতা, মাত্রাধিক যোগফলপ্রবণতা (overaggregativeness), সঞ্চয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগে ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার নিকটতম পরিকল্পনা চিন্তা এর

মধ্যে ছিল যা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল (পৃঃ ৫৯)। মহলানবীশের যোজনা রূপরেখার সাফল্য এক অনুগত শিল্প কাঠামো নির্মাণ। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন : ভারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে গড়তে হয়েছিল এজন্যে যে বেসরকারী ক্ষেত্রের সেরকম সম্পদ বা ক্ষমতা কোনটাই ছিল না (পৃঃ ৫৯-৬০)। কায়েমীস্বার্থবাদীদের মহলানবীশ রূপরেখার বিরুদ্ধে কুৎসার যেমন তিনি মুখের মতো জবাব দিয়েছেন তেমনি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছেন যে মহলানবীশও পশ্চিমী অর্থবিজ্ঞানীদের মতো ভারতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরম্পরাগত ও বিষম চরিত্র সম্পর্কে মনোযোগী ছিলেন না।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ক্রমপ্রসার যেন সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ তৈরী করছে, আর বেসরকারী ক্ষেত্রের তথা একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির পথরোধ করছে। লেখক ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারত প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিকাশ চরিত্র বিচার করে বলেছেন : "State ownership has often been identified in these countries as socialism. This is far from the truth. State ownership, on the contrary, has been called for by the private industrialists themselves for their own class interest. State enterprises provided them with a market where they could sell at a high profit" (pp 180-81)। রাষ্ট্রীয় মালিকানা এ সব দেশে সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত হয় প্রায়শ। এ আদৌ সত্য নয়। পরন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে বেসরকারী শিল্পপতিরা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই চায়। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি তাদের এমন এক বাজার যুগিয়েছে যেখানে তারা উচ্চহারে মুনাফা লাভ করে।

অনেক মার্কসবাদে বিশ্বাসী নেতা এখনো রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বহিরঙ্গ বৃদ্ধির কথা বলে বুর্জোয়া নেতাদের প্রগতিশীল ফতোয়া দেন। তাঁদের স্মরিয়ে দিতে চাই ডঃ নীহার সরকারের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থশাস্ত্র-বিদের সুচিন্তিত বক্তব্য, মার্কসীয় অর্থবিজ্ঞানেও যাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র এমন এক শিল্প ব্যবস্থাপনার প্রতিরূপ, যে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে দুর্বল ও অবিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক শ্রেণীর কাছে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে

কাম্য এবং বুর্জোয়ারা স্বপ্ন দেখে যে, উৎপাদনে লোকসানের পর্ব শেষ হলেই এ সকল সংস্থা বেসরকারী শিল্পপতিদের হস্তগত হবে, যেমন হয়েছিল জাপান ও তুরস্কে (পৃঃ ১৮১)।

লেখক আমদানী বিকল্প নীতি, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে যে দৃষ্টিপাত করেছেন তা বিরল ও অনুসরণীয়। আমদানী বিকল্প নীতির নামে বিকাশ হার হ্রাস (ভর্তুকি, শুল্ক ছাড় প্রভৃতি বাবদ ও পণ্য উৎপাদন পরিব্যয় বৃদ্ধির কারণে), তৃতীয় দুনিয়ার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিষময়তা, অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র শিল্প উৎসাহদানের দরুণ আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশলের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির ক্ষতিজনকতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশপথের অধ্যায়টিও উল্লেখযোগ্য। তিনি অপুঁজিতান্ত্রিক পথের প্রশ্ন তুলেছেন। সমাজতান্ত্রিক পথের পরিবর্তে অপুঁজিতান্ত্রিক পথ অভিধা ব্যবহারকে তিনি 'দুর্ভাগ্যজনক' বলেছেন (পৃঃ ১৮৫)। অপুঁজিতান্ত্রিক পথ আধুনিক সোভিয়েত লেখকদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে এ পথের কথা প্রথম বলা হয় এবং লেনিন নিজেই অপুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে। অধিকন্তু, অপুঁজিতান্ত্রিক পথ কোনো তৃতীয় পথ নয়, সমাজতান্ত্রিক পথেরই অন্যতর রূপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে এ পথকে বলা হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ। অপুঁজিতান্ত্রিক পথ বলতে কেবল পুঁজিতন্ত্র পরিহার করা বোঝায় না, যেমন ভারতের মতো দেশে পুঁজিতন্ত্র পরিহারের প্রশ্ন অবান্তর—কারণ এখানে পুঁজিতন্ত্র ইতিমধ্যেই অনেক বিকশিত। এখানে উন্নত পুঁজিতন্ত্রকে পরিহার ও তার পরে পুঁজিতন্ত্রের পথ ছেড়ে পুঁজিতন্ত্রবিরোধী পথে পদার্পণই অপুঁজিতান্ত্রিক রূপ হবে—এ পথ হবে মূলত অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট পথ। অধ্যাপক সরকার এ পথের মর্মকথাকে অবশ্য তুলে ধরেছেন কয়েকটি কথায়: "সমাজতান্ত্রিক বা অপুঁজিতান্ত্রিক পথ শ্রেণী-সংগ্রাম এড়িয়ে চলে না, বরং সর্বাপেক্ষা কার্যকরী শ্রেণীসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় যা বৃহৎ বুর্জোয়াদের (অর্থাৎ অ-একচেটিয়া পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজি) ও তাদের আধা সামন্তবাদী ও উপনিবেশবাদী মৈত্রীদের পরাভূত করবে। এটা পুঁজিতন্ত্রবিরোধী কারণ এর লক্ষ্য পুঁজিতন্ত্র তথা বুর্জোয়া মতাদর্শের

পরাভব। এজন্য তিনি যথার্থভাবেই বলেছেন ব্যাপক গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচীর ভিত্তিতে পুঁজিতন্ত্রবিরোধীদের ঐক্যই প্রথম শর্ত হিসেবে পরিগণিত করতে হবে (পৃ: ১৮৭-৮৮)।

অধ্যাপক নীহার সরকারের এই বইটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একটি জটিল বিষয় তিনি যথাসম্ভব স্বচ্ছভাবে আলোচ্য করে তুলেছেন। গ্রহণ করেছেন মার্কসীয় পদ্ধতি। ছকে বাঁধা পথে মার্কসবাদকে চালু করার হীনমন্যতা তিনি সযত্নে পরিহার করতে পেরেছেন। মিরডাল, হ্যানসেন, প্রেবিশ প্রভৃতি আমূল পরিবর্তনকারী অর্থশাস্ত্রবিদদের ত্রুটি এখানে যে, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক পথকে স্বীকার করেন না। অধ্যাপক সরকার এই সীমাবদ্ধতার কথা তুলেছেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী মহলে সূত্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে সচেতন করেছেন। এ গ্রন্থটি যে কোনো মার্কসবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে সমাদৃত হোক।

শঙ্কর রায়

বিয়োগপঞ্জী

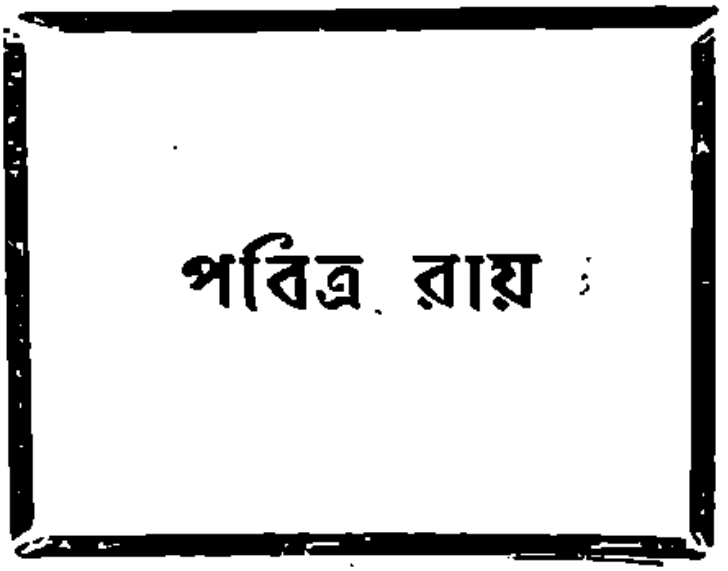

চার দশক আগেও ছোট্ট অর্জুনের স্বাস্থ্যকে
বলা যেত নিছক ভাগ্যের হাতে ভিক্ষা।

আজ হাজার হাজার মানুষের হাতের নাগালে, ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌-এর তৈরি উন্নতমানের ওষুধ

১৯৬৬ সালে জনকয়েক ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, রসায়নবিদ্‌ ও ফার্মাসিস্ট বন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ দেশবাসীর সামর্থ্যের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ পত্রের সোচ্চনীয় অভাবের ভয়াবহতা।

তাঁদের সেদিনের প্রতিকারের প্রয়াস পরিণতি পেয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌-এর বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রে। ফলে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অব্যাহতি পেয়েছেন ওষুধের অভাব থেকে, ছোট্ট অর্জুনের মতোই।

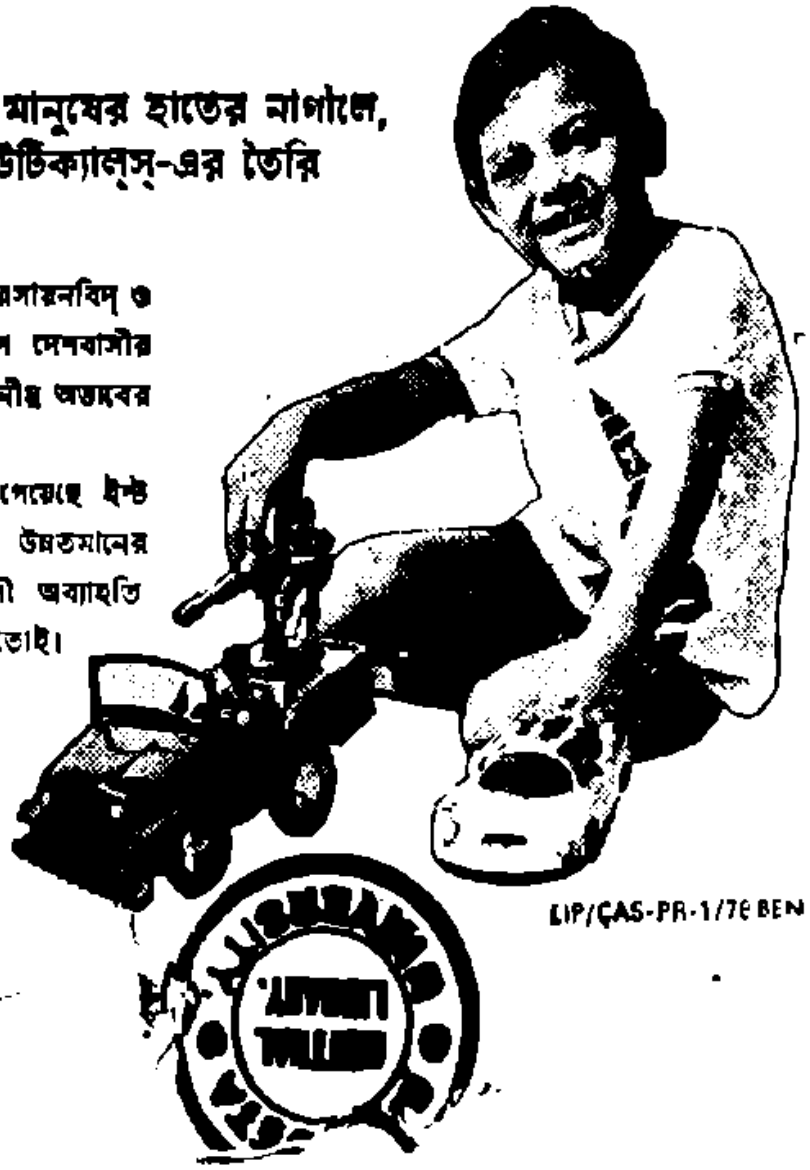

ডাক্তারদের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া একটি বিশ্বস্ত নাম

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
৬ লিটল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৯

LIP/CAS-PR-1/78 BEN

2 2 JUN 1980

MUHAMMAN
Vol. XV No. 1
Regd. No. W B 38
R. N. 1378/65